অনুজ কথাশিল্পী

শ্রীমান সতীনাথ ভাদুড়ী

কল্যাণবরেঃ

বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও সমস্যা

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার নমস্কার ও প্রীতি গ্রহণ করুন। আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে সত্যিই আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। মেদিনীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ আমাকে সে সুযোগ দিয়েছেন ব'লে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতিপূর্বেও তাঁরা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সাংসারিক কারণ বশত আমি তখন আসতে পারি নি।

মেদিনীপুর শুধু বাংলাদেশের নয়, সমস্ত ভারতের তীর্থ। মেদিনীপুরের নাম এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, চিরকাল থাকবে। এ দেশের অগ্রগতির ইতিহাসে মেদিনীপুরের দান এত বহুল এবং অসামান্য যে তা নিয়ে বলতে আরম্ভ করলে সময়ে কুলুবে না। অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ তা নিয়ে লেখা হয়েছে, আশা করি ভবিষ্যতে আরও হবে। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আত্মাহুতি মেদিনীপুরকে পুণ্যতীর্থের মর্যাদা দান করেছে তার ইতিহাস অগ্নিযুগের এবং অসহযোগ আন্দোলনের বিস্ময়কর আত্মবিসর্জনেই সীমাবদ্ধ নয়, সে ইতিহাস আরও প্রাচীন। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে, পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা উত্তোলন করেন প্রথম এই মেদিনীপুরবাসীরাই। জঙ্গল মহলের বিদ্রোহ, জেনারেল ফার্গুসনের সঙ্গে ঝাড়গ্রামের বৃদ্ধ তেজস্বী রাজার সংগ্রাম, চুয়াড় সৈন্যদের বীরত্ব, ঘাটশীলার যুদ্ধ, খড়্গপুরের জমিদার নরহরি চৌধুরীর দুর্দমনীয়তা এবং আরও অনেক বীরত্ব-

ব্যঞ্জক ঘটনা ইংরেজ ঐতিহাসিকরাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুর অমরত্ব লাভ করেছে।

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও মেদিনীপুরের দান কম নয়। যে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরে আজ আমরা সমবেত হয়েছি 'বীরসিংহের সিংহ শিশু' সেই বিদ্যাসাগর বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে একজন দিক্‌পাল। আধুনিক বাংলা গদ্যের তিনি জনক, স্ত্রী-শিক্ষা-প্রসারে তিনিই অগ্রণী, নিপীড়িতা নারীদের দুঃখ মোচন করবার জন্য এমনভাবে সর্বস্বান্ত আর কেউ হন নি। তাঁর জন্মভূমিতে এসে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। "দীন যথা যায় দূরে তীর্থ দরশনে"—এখানে ঠিক সেই মনোভাব নিয়েই আমি এসেছি।

মেদিনীপুরের বিরাট ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ক'রে আমি সাহিত্য বিষয়ে এইবার কিছু নিবেদন করব।

বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ কি তা আপনাদের অবিদিত নেই। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পর্যন্ত তার উন্নয়নের ইতিহাস বিস্ময়কর। এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্য এত উন্নতি করেনি।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যও নিজস্ব স্বকীয়তায় এবং বৈচিত্র্যে দেদীপ্যমান। রবীন্দ্রোত্তর যুগে শুধু সৃষ্টিধর্মী কাব্য সাহিত্যই নয়, জ্ঞানধর্মী সাহিত্যও বাংলাভাষাকে অলঙ্কৃত করেছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন গবেষণা-মূলক প্রত্নতত্ত্ব, ভ্রমণকাহিনী, লঘু নিবন্ধ, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ এবং আরও নানারকম রচনাতেও বাংলা সাহিত্য ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হচ্ছে।

সাহিত্য বলতে সাধারণত সবাই কাব্য সাহিত্যই বোঝেন। ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক সবই কাব্য সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে কাব্য সাহিত্যের উৎকর্ষ প্রধানত রূপায়িত হয়েছে ছোট গল্প এবং উপন্যাসে। নানা আঙ্গিকে

বিচিত্র বিষয় বস্তু নিয়ে রচিত হচ্ছে এ যুগের গল্প ও উপন্যাস। কিন্তু এর বেশী প্রশংসা-বাক্য আমি আর উচ্চারণ করব না, করলে সেটা অশোভন হবে, কারণ আমি নিজেই রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন সাহিত্য-সেবক। আমাদের সৃষ্টির মধ্যে ভালো যা কিছু আছে তা বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করেছে, তা নিয়ে আমি বেশী বাগাড়ম্বর করতে চাইনা। আমি বরং এর ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করব। বহুকাল ধ'রে সাহিত্য সেবা করছি, অন্তর থেকে সত্য ব'লে যেটা অনুভব করেছি তাই কর্ত্তব্যবোধে নিবেদন করছি, বিদ্বেষ বশত নয়।

ছোট গল্প এবং উপন্যাসের বিষয় বস্তু মানুষেরই সুখ দুঃখ মানুষেরই আশা-আকাঙ্খা। এই সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খার সমুদ্র-মন্থনে মানুষের জীবনে সুধা এবং বিষ দুইই ওঠে। জীবনদ্রষ্টা কবি এই সুধা আর বিষ নিয়েই কাব্যের নৈবেদ্য রচনা করেন। কিন্তু যিনি বড় কবি তিনি তাঁর কাব্যের কলা-কুশলতায় বুঝিয়ে দেন যে বিষ যদিও জীবন-মন্থনের অপরিহার্য ফল, কিন্তু তা পরিহার ক'রে চলতে পারলেই বেশী আনন্দ, সুধাপান করলে আরও আনন্দ, একেবারে অমরত্ব। লক্ষ্য করেছি আজকাল কোন কোন লেখক বিষটাকেই মোহন মধুর ক'রে পরিবেশন করছেন। ভাবে ভঙ্গীতে বলছেন অমৃতের প্রতি আগ্রহ একটা সেকেলে কুসংস্কার, বিষ-পান করাটাই যথার্থ পৌরুষ, বিষ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই, বিষে জর্জরিত হ'য়ে মৃত্যুবরণ করাটাই মানবের নিয়তি। বিষ-পান প্রসঙ্গে শিবের কথা মনে পড়ছে, তিনি বিষ-পান ক'রে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দেবতা বা দৈত্য কাউকে বিষপানে উৎসাহিত করেন নি, সৃষ্টি পাছে হলাহলে নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্যেই বিষপান করেছিলেন তিনি। মহাকালের মতো মহাকবিও জীবনের বিষপান করবেন, জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হ'লে বিষপান করতেই হবে, কিন্তু তিনি

বিতরণ করবেন সুধা, সকলকে উৎসাহিত করবেন সুধার সন্ধানে। যৌন-লালসার ইন্ধন জুগিয়ে বা বিষয়-তৃষ্ণা জাগিয়ে বেরসিক ইতর লোকের মনোরঞ্জন করা সহজ, কিন্তু শাশ্বত সাহিত্যের কোঠায় উঠতে হলে এমন কিছু সৃষ্টি করতে হবে যার আবেদন শাশ্বত। যৌন-ক্ষুধা বা বিষয়-ক্ষুধা কোন সভ্য মানুষেরই গৌরবের জিনিস নয়, লজ্জার জিনিস। তার খাদ্য যারা সরবরাহ ক'রে তাকে আমরা গোপনে মূল্য দিতে পারি, কিন্তু প্রকাশ্যে কখনও শ্রদ্ধা করি না! কোনও সুস্থ সভ্য সমাজে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল সাহিত্য বেশী দিন টেকে নি। নীতি-বিরুদ্ধ ব'লে নয়, অসুন্দর ব'লে। যা সুন্দর তার সঙ্গে সত্য ও শিবও জড়িত থাকেন অবিচ্ছেদ্য ভাবে।

বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে যাঁরা কুরুচির বেসাতি করেন তাঁরা ভুলে যান যে তাঁরা বিজ্ঞানী নন, বিজ্ঞানের বইও তাঁরা লিখছেন না, তাঁরা এমন কিছু করতে যাচ্ছেন যা বিশ্লেষণ নয়, যা সৃষ্টি। বিজ্ঞানের সাহায্যই যদি নিতে হয় তাহ'লে তা ওই সৃষ্টির সহায়করূপে নিতে হবে, মালী যেমন ফুল ফোটাবার জন্য সারের সহায়তা নেয়। কিন্তু ফুলই যদি না ফুটল, তাহ'লে সারের তত্ত্ব, তা সে যত গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই হোকনা কেন, পুষ্পরসিককে মুগ্ধ করতে পারবে না।

এইসব কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল অসুন্দর রচনার প্রেরণা যদি আত্মিক না হ'য়ে আর্থিক হয় (ভালো ছবির চেয়ে অশ্লীল picture post cards এর বিক্রি সত্যিই তো বেশী) তা হলে অবস্থাটা আরও শোচনীয়।

আর এক ধরণের লেখা বেরুচ্ছে যাতে সমাজের মন্দ দিকটা তার কুৎসিত অংশটাই লেখকের একমাত্র উপজীব্য। তাঁর চোখে সমাজের বা মানুষের ভালো দিকটা পড়ে নি, তিনি মানুষের রূপটা দেখেন নি; দেখেছেন তাঁর মুখের ব্রণগুলি। এই মক্ষিকাবৃত্তির মূলেও হয়তো আছে সস্তা জন-প্রিয়তা অর্জন ক'রে সংসার চালাবার চেষ্টা।

অর্থনৈতিক চাপে প'ড়ে ডাক্তারি, মাষ্টারি, ওকালতি, দোকানদারি, নেতাগিরি সবরকম পেশাই আদর্শপথচ্যুত হ'য়েছে, সাহিত্য-পেশারও যে এ দুর্গতি হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমাদের দেশে সাহিত্যকে লেখকরা পেশারূপে গ্রহণ করেছেন সম্প্রতি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাঁরা নির্মাতা, তাঁদের কেউ পেশাদার সাহিত্যিক ছিলেন না। বই বিক্রি ক'রে তাঁরা পয়সা পেয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা ছিল উপরি পাওনা। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের জন্য সাহিত্যের দাক্ষিণ্যের উপর তাঁদের নির্ভর করতে হয়নি, প্রায় প্রত্যেকেরই অর্থাগমের অন্য আর একটা উপায় ছিল। অনেকে এমন মত পোষণ করেন যে সাহিত্যকে পুরোপুরি পেশায় পরিণত না করলে খাঁটি সাহিত্যিক হওয়া যায় না। আমার মনে হয় সাহিত্যকে নিছক পেশায় পরিণত করলে তা সৃষ্টি-ধর্মী প্রতিভার স্বাধীন বিকাশের অনুকূল হবে না। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ফোটাতে চান তা ফোটাতেই পারবেন না যদি তা জন-প্রিয় না হয়, যদি তার বাজার দর না থাকে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁর অন্য আর একটা উপায় থাকা প্রয়োজন, তা সে পিতৃ-পুরুষের সম্পত্তি হোক, চাকরি হোক বা আর কিছু হোক। বিখ্যাত শিল্পী ভ্যান গাউ কোনও ছবিই বোধ হয় আঁকতে পারতেন না যদি না তাঁর ছোট ভাই তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিতেন। তাঁর জীবনে ছবির বাজারে তিনি স্বীকৃতি পান নি। ছবি বিক্রি ক'রে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের মতো অর্থ সংগ্রহ করাও অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। ভাই না থাকলে জন-প্রিয়তার সস্তা পথে চ'লে তৎকাল-প্রচলিত রুচির খোরাক জুগিয়ে জীবন ধারণ করবার তাগিদেই তিনি অসংখ্য পেশাদার শিল্পীর ভীড়ে আর একজন পেশাদার শিল্পী মাত্র হতেন, যে মহিমা ভ্যান গাউ অর্জন করেছেন সে মহিমা তিনি অর্জন করতে পারতেন না। এ রকম আরও অনেক উদাহরণ দেখানো

যেতে পারে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়তো আছে, কিন্তু এ কথাটা মোটামুটি মানতেই হ'বে যে পেটের দায়ে বা পেশার চাপে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে তার মহত্ত্ব বা অভিনবত্ব নষ্ট হবার সম্ভাবনা। শিল্পের মহত্ত্ব বা অভিনবত্বকে সম্যক মূল্য দিতে জনসাধারণ অনেক সময় অনেক দেরী করে।

কিন্তু একথাও মানতে হ'বে যে অর্থনৈতিক চাপে অনেক সাহিত্যিকই সাহিত্যকে পেশারূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সাহিত্য-সম্পর্কিত একটি পেশা অবশ্যই আছে যা সাহিত্যিকদের জীবনের সঙ্গে অনেকটা খাপ খায়। এ যুগের অনেক প্রতিভাবান লেখক সেই পেশাকে আশ্রয় ক'রেই বেঁচে আছেন। সে পেশার ইংরেজি নাম জারনালিজম্ (journalism) অর্থাৎ কোন সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রে চাকরি করা। এই পেশা অবলম্বন ক'রে এদেশে এবং বিদেশে অনেক লেখক প্রথম শ্রেণীর কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এ নজীর আছে। কিন্তু এ কথাটা মনে রাখা উচিত যে সংবাদপত্রে চাকরি করাটা সাহিত্য-সেবা নয়, সেটা আর পাঁচরকম চাকরির মতোই আর একটা চাকরি মাত্র। সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সাহিত্য-চর্চা করার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিপদও আছে। প্রত্যেক সংবাদপত্রই কোন না কোন রাজনৈতিক মতের পোষক। সে মতের সঙ্গে সায় দিতে না পারলে সেখানে চাকরি করা যায় না, আর সায় দিতে আরম্ভ করলে সায় দিতে দিতে অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর কাব্য-সৃষ্টিতেও সেই বিশেষ ধরণের রাজনীতির ছোঁয়াচ লাগে, পেঁয়াজের ঘনিষ্টতায় ভালো খাঁটি দুধও পেঁয়াজ-গন্ধী হয়ে যায়। সেই রাজনীতি-গন্ধী সাহিত্য যদি সম্যকরূপে রসোত্তীর্ণ না হয় তাহ'লে শিল্প-লোকে আর তার স্থান হয় না, তা উক্ত রাজনীতির বিজ্ঞাপন হয়ে পড়ে।

সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক থাকা উচিত কি না এই প্রসঙ্গে সেই কথা উঠে পড়ে। জীবন নিয়েই যখন সাহিত্য এবং

জীবনের সঙ্গে রাজনীতির যখন সম্পর্ক আছে তখন সাহিত্যে রাজনীতির কিছু কিছু থাকবে বই কি। কিন্তু কেবল রাজনীতি নিয়েই জীবন নয়, জীবন অতিশয় জটিল এবং রহস্যময় অভিব্যক্তি, তা কেবল রাজনীতি, কামনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতিরই সমবায় নয়, তা আরও ব্যাপক, আরও গভীর। জীবনের সম্বন্ধে এই ব্যাপক গভীর সমগ্র দৃষ্টিই কবির দৃষ্টি। সমাজে নানারকম মানুষ আছে। কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ মুনাফাখোর, কেউ দারিদ্র্য-জর্জরিত, কেউ লম্পট কেউ নীতিবাগীশ—মানুষের গায়ে মাত্র এই লেবেল-গুলি লাগিয়েই কবি সন্তুষ্ট হন না, সার্থক কাব্য সৃষ্টিতে কেবল এই সংবাদগুলি বা এই সংবাদগুলির ফেনায়িত উচ্ছ্বাসই প্রাধান্য লাভ করে না, যদি করত তাহলে তিনি কবি হতেন না, সাংবাদিক মাত্র হতেন। তিনি তাঁর কাব্যে মানুষের সম্বন্ধে এমন সব সত্য খবর দেন যা কেবল তাঁরই কবি-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। Forster সাহেব রসোত্তীর্ণ উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন —"In this direction fiction is truer than history because it goes beyond the evidence."

সুতরাং যদি কোনও কাব্যে একটা বিশেষ নীতি নিয়ে কোনও লেখক মাতামাতি করেন তা খুব উঁচুদরের কাব্য হবে না। কারণ তাতে জীবন-জিজ্ঞাসার সমগ্রতা পাওয়া যাবে না। অপরিহার্য এই অজুহাতে কোন একটা নীতিকে কাব্যে প্রাধান্য দিলেই তার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। জলও জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য। কোনও কাব্য যদি কেবল জলময় হয়ে ওঠে, আকাশ বাতাস আলো মাটির খবর তাতে যদি না থাকে, তাহলে তা নিশ্চয় খুব উপভোগ্য কাব্য হবে না।

বর্ত্তমান যুগের গল্প উপন্যাসে রাজনীতির প্রভাব একটু বেশী রকম পড়েছে। এর কারণও খুব স্পষ্ট। বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতার ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা খুব বেড়েছে, প্রত্যেক মানুষের

মনেই অশান্তির আগুন জ্বলছে। আর আমরা প্রত্যেকেই মনে করছি কোনও একটা বিশেষ ছাঁচের রাজনীতির সহায়তা নিয়েই বুঝি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা-অশান্তির অবসান ঘটবে। কিন্তু তা যে ঘটবে না তার প্রমাণ ত' ইতিহাসের পাতায় প্রত্যহ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কিন্তু তবু আমাদের রাজনীতির সম্বন্ধে মোহ ঘুচছে না। আর্ত্ত রোগী যেমন শতমারী সহস্রমারী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, আমরাও তেমনি দুঃখ-দুর্দশায় কাতর হয়ে রাজনৈতিক নেতার শরণাপন্ন হচ্ছি। এই শোচনীয় অবস্থার চিত্র তাই অনেক গল্পে উপন্যাসে রূপায়িত হয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে। চিররোগীর হাতে যদি অব্যর্থ ফলপ্রদ কোনও ওষুধের বিজ্ঞাপন পড়ে তাহলে তা সে যত আগ্রহের সঙ্গে পড়বে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সে তত আগ্রহের সঙ্গে পড়বে না।

একথাটা কিছুতেই আমাদের মাথায় ঢুকছে না যে অঙ্ক ক'ষে তর্ক ক'রে বা ভোট কুড়িয়ে সাময়িক ভাবে আমরা জীবন যাপনের মানদণ্ডে হয়তো কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারি, কিন্তু কেবলমাত্র সেই পরিবর্তনটুকু ঘটলেই আমরা শান্তি পাব না। রাজনীতির চেয়ে মহত্তর নীতির আশ্রয় না নিলে আমাদের অশান্তি ঘুচবে না। প্রথম শ্রেণীর কাব্য-সাহিত্য মানুষের মনকে সেই মহত্তর নীতির দিকে উন্মুখ করে। তা যদি না করতে পারে তাহলে সাময়িকভাবে তা যতই না জনপ্রিয় হোক শেষ পর্য্যন্ত তা টিকবে না। মানুষের মনে একটা শাশ্বত ক্ষুধা আছে সেই ক্ষুধার সুধা যে কাব্যে সঞ্চিত হয়েছে সেই কাব্যই সার্থক কাব্য, সাহিত্য জগতে সেই কাব্যই অমরত্ব লাভ করবে।

রাজনীতির দ্বন্দ্বে বাঙালীর পরাজয় ঘটেছে এটা অনেকরই বদ্ধমূল ধারণা। বাঙালীই স্বাধীনতা মন্ত্রের উদ্গাতা, স্বাধীনতা লাভের জন্য বাঙালী অনেক ত্যাগ করেছে কিন্তু স্বাধীন ভারতে বঙ্গ ভাষাভাষীর আধিপত্য নেই বললেই চলে—এই ক্ষোভ অনেক

বাঙালীর অন্তরকে বিষময় ক'রে তুলেছে। যে আধিপত্য ভোটের উপর নির্ভর ক'রে সে আধিপত্য পাওয়ার আশা কোনও একটি ভাষা-ভাষীর পক্ষে দুরাশা মাত্র। ভারতবর্ষে অবাঙালীর সংখ্যাই বেশী, সুতরাং অবাঙালীরাই ভারতবর্ষের লোকসভায় প্রাধান্য লাভ করবে এ তো জানা কথা। ওই অবাঙালীরাও ভারতবাসী, তারাও আমাদের সঙ্গে নানা বন্ধনে সংযুক্ত, তাদের সঙ্গে একাত্মতা যদি অনুভব করতে পারি তাহলেই আমাদের মনের গ্লানি দূর হবে। পুরাকালে একধর্ম-সূত্র-পাশে সমগ্র ভারত বাঁধবার চেষ্টা হিন্দু-মুসলমান দু'দলই করেছিলেন। সে যুগের ধর্ম এখন কুসংস্কার ব'লে গণ্য হয়েছে, কিন্তু সমগ্র ভারতকে এক পাশে বাঁধবার আগ্রহ এখনও কমে নি। ধর্মের স্থান গ্রহণ করেছে এখন রাজনৈতিক আদর্শ। আজকাল শাসন পরিষদে প্রাধান্য লাভ করতে হলে রাজনীতির মাধ্যমেই তা করতে হবে, ভাষা বা প্রাদেশিকতার সহায়তায় তা কখনও করা যাবে না। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে আমাদের বাঙালীত্ব বোধের একটা জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে গেছে অনেকের মনে। তিক্ত হয়ে আছে অনেকের মন। এতে আমাদের সাহিত্যেরও ক্ষতি হয়েছে। কারণ সুস্থ মন না থাকলে ভালো সাহিত্য সৃষ্টিও করা যায় না, উপভোগও করা যায় না। একটা কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত। অন্য ক্ষেত্রে যাই হোক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের উচ্চাসন এখনও অবিসম্বাদিত রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজনীতির আবর্তে আমাদের মানস-সরোবরের জল যেন ঘোলা না হ'য়ে যায়, বাঙালী মাত্রেরই সে দিকে নজর রাখা উচিত। ভালো কাব্য সৃষ্টি বা উপভোগ করবার ক্ষমতা যদি আমরা হারাই তাহলে আমাদের সর্বনাশ হ'বে।

কবিতার ক্ষেত্রে দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কবিশেখর কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁদের কাব্যধারা এখনও অব্যাহত

রেখেছেন যদিও, তাঁদের অনুগামী কয়েকজন কবিও তাঁদের অনুসরণ করছেন, কিন্তু নূতন কবির ভালো কবিতা খুব কমই চোখে পড়ছে। বিদেশী আধুনিক কবিদের নকলে একজাতীয় হেঁয়ালী আজকাল কবিতার নামে কাগজে ছাপা হচ্ছে, কোন সুস্থমনা রসিক সে সব লেখাকে কবিতা আখ্যা দেবেন না। এগুলো অনেকটা জিগ্‌স-পাজ্‌লের মতো, অনেক মাথা ঘামাবার পর একটা কষ্ট-কল্পিত অর্থ সে সব থেকে হয়তো বার করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তা চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে না, চিত্তকে ঠিক সেই লোকে নিয়ে যায় না যেখানে যাওয়ার জন্য রসিক চিত্ত সতত উন্মুখ। এ দলের অনেকে বলেন উচ্চাঙ্গের গান বা ছবি বুঝতে হলে মনকে যেমন বিশেষভাবে তৈরি করতে হয়, এ ধরণের কবিতার মর্ম বুঝতে হ'লেও তাই করতে হবে। এঁরা আরও বলেন বীজ-রূপে এ সব কবিতার মধ্যে না কি অনেক সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বিশ্লেষণী-শক্তি সম্পন্ন সুধীই কেবল সে সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন মোচন করতে পারবেন। অশিক্ষিত লোকও উচ্চাঙ্গের গান শুনে বা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়, হয়তো সে তার সম্পূর্ণ রস পায় না, কিন্তু চমৎকৃত যে হয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কারণ উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি মাত্রেরই এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত সহজবেদ্য রূপ আছে যা সকলেরই চিত্তকে স্পর্শ করে, রসিকের চিত্তকে তো নিশ্চয়ই করে। তা কোন বিশেষ শিক্ষা বা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। বিশ্লেষণ করলে ঊষর মরুতে বা ধূসর পাংশুস্তূপেও জলকণা পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই জলকণাটুকুতে রসিকের আনন্দ হয় না, যেমন হয় নির্ঝরিণীর ছন্দমুখর নৃত্যে, তরঙ্গিনীর উর্মিলীলায়, সমুদ্রের বিরাট গাম্ভীর্যে বা ফুলের উপর কম্পমান শিশির বিন্দুতে। কবিতার যদি সহজবেদ্য সাবলীলতা না থাকে তাহলে তার কিছুই রইল না।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা ছোট একটি বড়ির মধ্যে সমস্ত ভিটামিন সংবদ্ধ করেছেন, তা সেবন ক'রে রোগীর হয়তো উপকার হয়, কিন্তু

খাদ্য-রসিকের তাতে আনন্দ নেই, তার আনন্দ টাটকা সুস্বাদু খাবারে। কবিতা-নাম-ধারী এই সব রচনার প্রধান দোষ, দুর্বোধ্যতা। মনে হয় যেন ইচ্ছে করে দুর্বোধ করা হয়েছে। এই সব দোমড়ানো-মোচড়ানো অর্থহীন ছন্দোহীন কিম্ভূত-কিমাকার অসম্বন্ধ বাক্যাবলীর অন্তরালে একটা চেষ্টাকৃত প্রয়াস আছে বলে সন্দেহ হয়। অনন্যতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু দুর্বোধ্য ব'লে তা রসোত্তীর্ণ হয় নি। যে দেশে এর জন্ম সে দেশের বৃহত্তর রসিক সমাজও একে কবিতার মর্যাদা দেন নি। একটা ছোটদল—তার মধ্যে ডিগ্রীধারী পণ্ডিত লোকও আছেন—এর অভিনবত্ব জাহির করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল-কাম হন নি। ওদেশের সাহিত্যেও এদের আবির্ভাব ক্রমশঃ কমে আসছে। অতি-আধুনিক বিদেশী সাহিত্যের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা দেখতে পাবেন ওদেশের কাব্য সাহিত্য আবার সাবেক পথে চলতে আরম্ভ করছে, অর্থাৎ বিলিতি অতি-আধুনিক কবিরা যে ভাষায় কাব্য রচনা করছেন তা দুর্বোধ্য নয়। বাংলা সাহিত্যেও ইদানীং দু'চারটে কবিতা চোখে পড়েছে যার মানে বোঝা যায়। আশা ক'রে আছি নূতন আঙ্গিকে নূতন বাঙালী কবিরা আবার আমাদের সত্যিকার নূতন কবিতা শোনাবেন।

আমাদের সাহিত্যের আর একটি দৈন্য প্রকট হয়ে রয়েছে আমাদের নাট্য-সাহিত্যে। ইদানীং ভালো নাটক রচিত না হবার কারণ কি? যাঁরা মনে করেন যে চলচ্চিত্রের জন-প্রিয়তাই রঙ্গমঞ্চের অবনতির কারণ তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। বাজারে চকোলেট বা টফির চলতি হয়েছে ব'লে আমরা তো সন্দেশ খাওয়া ত্যাগ করিনি। যে দেশে সিনেমার উদ্ভব সে দেশেও তো নাটকের আদর কমে নি। আমাদের দেশেই গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে সখের থিয়েটারেরও অভাব নেই। তবু ভালো নাটক লেখা হচ্ছে না কেন? আমার মনে হয় যে সব লেখকদের ভালো নাটক

লেখবার ক্ষমতা আছে তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহ পাচ্ছেন না। অভিনীত না হলে নাটক লেখার সার্থকতা নেই। প্রকাশক বই ছেপে তা যেমন সাধারণ্যে প্রচার করেন পেশাদার রঙ্গমঞ্চও তেমনি নাটক অভিনয় ক'রে তা সাধারণের গোচরে আনেন। কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে যে সব নাটক অভিনীত হয় মফঃস্বলের নাট্যামোদীরা সেই সব নাটকই মঞ্চস্থ করেন। অর্থাৎ কলিকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চই এদেশে নাট্য জগতে প্রবেশের দ্বার। নূতন নাট্যকারদের পক্ষে সে দ্বার বন্ধ। যদি বা কারও ভাগ্যে দ্বার একটু খোলে তিনি পয়সা পান না। নূতন নাট্যকারকে পয়সা দিয়ে উৎসাহিত করতে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষরা রাজী নন। নূতন লেখকের লেখা বই চুরি ক'রে অদল-বদল ক'রে লেখককে ফাঁকি দেবার চেষ্টাও করেন এঁরা। তাই প্রতিভাবান নাট্যকারেরা নাটক লেখাই ত্যাগ করেছেন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি রাত্রির পর রাত্রি পুরাতন নাটকেরই অভিনয় ক'রে সন্তুষ্ট আছেন, এতেই তাঁদের ব্যবসা হয়তো চলে যাচ্ছে। নাট্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন। যখন নাট্য-সাহিত্যে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল তখন নটগুরু মহাকবি গিরিশচন্দ্র ছিলেন। তাঁর নিজেরই থিয়েটার ছিল, নাটকের পর নাটক লিখে তিনি নিজের থিয়েটারেই তা অভিনয় করতেন। তিনি কেবল প্রতিভাবান নাট্যকার এবং নটই ছিলেন না, তাঁর হৃদয়ও প্রশস্ত ছিল। তিনি সমসাময়িক নাট্যকারদের উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেন নি। তাই বাংলার নাট্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে রসরাজ অমৃতলালের, দ্বিজেন্দ্রলালের, ক্ষীরোদ প্রসাদের এবং আরও অনেকের ভাল ভাল নাটক আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। বাংলার রঙ্গমঞ্চে প্রতিভাবান অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন, কিন্তু প্রতিভাবান নূতন নাট্যকারদের সেখানে ভদ্রভাবে প্রবেশ করবার সুযোগ নেই। আমাদের গভর্ণমেণ্ট যদি সুপরিচালিত রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি ক'রে নূতন নাট্য-

কারদের যথোচিত মর্যাদায় সেখানে স্থান দিতে পারেন, তাহলেই এর প্রতিকার হবে। শুনেছি গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন, সুতরাং আশা আছে প্রতিভাশালী নাট্যকারগণ আবার বাংলা রঙ্গমঞ্চকে প্রাণবান ক'রে তুলতে পারবেন, বাংলা নাট্য-সাহিত্যও আবার সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

সাহিত্যের কথা তো অনেক হ'ল, এবার পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের একীকরণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না; কারণ এই একীকরণের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হবে কিনা তা চিন্তা ক'রে দেখা উচিত।

আমরা তিন পুরুষ বিহারে বাস করছি। আমার জন্ম বিহারে, বিহারী সমাজে এবং বিহারী পরিবেশেই আমি মানুষ হয়েছি, তাদের মধ্যে থেকেই আমি সাহিত্য-চর্চা করেছি, অন্নসংস্থানও করছি। তাদের আমি ভালবাসি, তাদের মহত্ত্বে ও সহৃদয়তায় আমি বিশ্বাস করি। বিহারী জনসাধারণ বাঙালীদের মতোই গুণগ্রাহী এবং সাহিত্যরসিক।

কিন্তু ভয় করি আমি রাজনৈতিক নেতাদের। তাঁরাই যত গণ্ডগোলের মূল। শুধু বিহারী নেতারা নয়, বাঙালী নেতারাও এ বিষয়ে দায়ী। ইংরেজেরা যে 'বাঙালী-বিহারী ফিলিং' সৃষ্টি ক'রে গেছেন এই নেতাদের নেতৃত্বে সে 'ফিলিং' ক্রমশঃ তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠেছে। এই একীকরণের ফলে যদি সে তিক্ততার অবসান ঘটে তাহলে তা নিশ্চয়ই আনন্দজনক, কিন্তু এই একীকরণের ফলে যদি সংখ্যা-লঘু বাঙালীরা সংখ্যা-গুরু বিহারীদের কবলে পড়ে আরও নির্যাতিত হয়, যদি বেনো জল ঢুকে তাদের ঘরের জলটুকুকেও বার করে নিয়ে যায় তাহলে তা আশঙ্কাজনক। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমগ্র ভারতের দিক দিয়ে চিন্তা করলে এই একীকরণ শুভফলপ্রসূ হবে বলেই মনে হয় যদি তাতে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁর বিবৃতিতে দেশবাসীকে জানিয়েছেন যে সে সুযোগ থাকবে, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের নিরপত্তার জন্য সংবিধানে তাঁরা রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রাখবেন। এইখানেই আমার একটু ভয় আছে। সংবিধানে রক্ষা কবচের ব্যবস্থা থাকলেই তা যে বর্ণে বর্ণে পালিত হবে এ প্রত্যয় অন্ততঃ বিহারবাসী বাঙালীদের নেই। এখনই সংবিধানে সংখ্যা-লঘু-সম্প্রদায়ের জন্য যে সব উদার আইন আছে সে সব যদি ঠিকভাবে অনুসৃত হ'ত তাহলে বিহারবাসী বাঙালীদের মন এত বিষিয়ে উঠত না। বিহারে হিন্দি ভাষা প্রচার ও প্রসারের জন্য যে খরচ বিহার গভর্ণমেণ্ট করেছেন ও করছেন অন্য ভাষার জন্য তার সিকির সিকিও করেন নি। যাদের মাতৃভাষা হিন্দি নয় হিন্দি ভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেবার জন্য ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছে। আর্থিক এবং রাজনৈতিক চেষ্টা তো হয়েইছে, শারীরিক বলপ্রয়োগ করাও হয়েছে এমন সংবাদও খবরের কাগজে পড়েছি। বিহারে বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া করবার সুযোগ খুব কম বিদ্যালয়ে আছে, যে সব বিদ্যালয়ে আছে সেগুলি শাসক-সম্প্রদায়ের কৃপাদৃষ্টি-বঞ্চিত। যে সব বিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হয়, সেখানকার পাঠ্যপুস্তকগুলি বাংলা হরফে মুদ্রিত বটে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মর্যাদার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। গ্রন্থকর্তারা প্রায়ই অবাঙালী। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের অনেক কলেজেই বাংলা পড়াবার অধ্যাপক নেই। ইংলণ্ডে আছে, জার্মানীতে আছে কিন্তু বিহারে নেই। ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পূর্বে গভর্ণমেণ্টের কাছে কিছু কিছু আথক সাহায্য পেত এখন তারা তার বদলে পায় কিছু হিন্দি বই। বাঙালী ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেও যথোচিত সম্মান পায়নি এরকম একাধিক উদাহরণ আমার জানা আছে। যেখানে প্রতিযোগিতা দ্বারা যোগ্যতা নির্ণীত হয় সেখানে কিছু কিছু চাকরি

বাঙালীরা পায় কিন্তু যেখানে তা হয় না সেখানে বাঙালীর চাকরি পাওয়া শক্ত, এমন কি নিয়োগ-কর্তা যদি বাঙালীও হন তবু তিনি যোগ্য বাঙালীকে চাকরি দিতে ভয় পান। হিন্দি রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু অনেক বিহারী নেতা তাঁদের ভাষণে তার-স্বরে বলেছেন যে হিন্দি is the national language of India. রাষ্ট্র-ভাষা আর National language এক জিনিস নয়, তবু ওঁরা সেটা বলছেন। আর একটি ভয়ঙ্কর আইনও বাঙালী সাহিত্যিকদের আথক ক্ষতির কারণ হয়েছে। এই আইনটি প্রণীত হয়েছিল ইংরেজ শাসনের আমলে। সে আইনটি হচ্ছে এই যে কোনও প্রাদেশিক ভাষায় কোনও বই প্রকাশিত হওয়ার দশ বৎসর পরে যে কোনও ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় তা অনূদিত হ'তে পারে মূল গ্রন্থ-লেখকের অনুমতি বা সম্মতি না নিয়েও। অনেক চতুর প্রকাশক ও অনুবাদক এই আইনটির সুযোগ নিয়ে অনেক বাংলা গল্প উপন্যাস হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন। তা ক'রে তাঁরা যে অর্থ উপার্জন করেছেন তাঁর অংশ মূল লেখকরা পাচ্ছেন না। আমার নিজেরই লেখা এইভাবে অনেক ভাষায় অনুদিত হয়েছে, অনেক সময় আমি তার খবর পর্যন্ত পাইনি, আকস্মিকভাবে কোনও বন্ধুর মুখে জানতে পেরেছি। কোন কোন ভদ্র অনুবাদক বা প্রকাশক অনুমতি নিয়েছেন অবশ্য, কেউ কেউ কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও দিয়েছেন, কিন্তু তা তাঁরা করেছেন ভদ্রতাবশে, আইনত আমি তাঁদের বাধ্য করতে পারতাম না। যে সব বইয়ের বয়স দশ বৎসর হয়নি তার অনুবাদ প্রকাশকেরা সহজে ছাপতে চান না, কারণ তাঁরা জানেন দশ বৎসর পরে গ্রন্থকারকে এক পয়সা না দিয়েও তাঁরা ওসব বই ছাপতে পারবেন। এ আইন সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বাঙালী লেখকদের। কারণ বাংলা বই, বিশেষতঃ বাংলা গল্প উপন্যাস, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যত অনূদিত হয়েছে অন্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় তত হয় নি।

তাই এই সব রক্ষা-কবচের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অনেকে নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছেন না, তাঁদের ভয় হচ্ছে যে হিন্দি অটোক্র্যাসি মদমত্ত মাতঙ্গের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পদ্মবনকে বিদলিত করবে।

আমার মনে হয় একীকরণ সত্ত্বেও বাংলা ভাষার শিক্ষা এবং বাংলা সাহিত্য-সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর ভার যদি বাঙালীদের হাতেই থাকে তাহলেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি ' হিন্দি ভাষা, হিন্দি সাহিত্য এবং হিন্দি শিক্ষার ভার বিহারীদের উপর থাকুক। কোনও জাতির ভাষা ও সাহিত্য তার অন্তরের জিনিস এবং তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেখানে ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের আধিপত্য সহ্য করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

বিহারী বাঙালী এক হয়ে আমরা বাঁধ বাঁধিতে পারি, খনি খুঁড়তে পারি, ফ্যাক্টারি বা কারখানা পরিচালনা করিতে পারি, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাষা-ভাষীরই স্বাতন্ত্র্য দাবী করবার ন্যায্য অধিকার আছে।

বঙ্গ-বিহারের সংযুক্ত সংবিধানে এ ব্যবস্থা করা অসম্ভবও নয়।

পাশাপাশি দু'টি সাহিত্য যদি নির্বিরোধে স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পায় তাহলে সাহিত্যের মাধ্যমেই আমাদের এই আপাত বিরোধের অবসান হবে একদিন। কারণ সাহিত্যের ধর্মই হচ্ছে একে অপরের সহিত প্রাণের বন্ধনে আবদ্ধ করা।

আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথাই বললাম সংস্কৃতির কথা ইচ্ছে ক'রে আমি তুলি নি। যে সংস্কৃতিকে আমরা বাঙালী সংস্কৃতি বলে জানি সে সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে থেকে লোপ পেয়েছে। আচারে-বিচারে পোষাকে-পরিচ্ছদে আহারে-বিহারে উৎসবে-সামাজিকতায়, পূজায়-পার্বণে যে বাঙালী-সংস্কৃতি সৌরভের মতো এককালে সকলকে মুগ্ধ করত তা আর নেই। অন্যান্য প্রদেশ-

বাসীর সঙ্গে অবাধ মিশ্রণের ফলে, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের সংঘাতে, রেডিও-সিনেমা-লাউড-স্পীকারের বহুল প্রচারে, নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে বাঙালী সংস্কৃতি মারা গিয়াছে। তা হারাবার ভয় আর নেই। আমরা পট কাঁথা পুঁথি প্রভৃতির সমাবেশ ক'রে মাঝে মাঝে যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি সেগুলি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান মাত্র। যে পাঁচ-মিশেলী সংস্কৃতি আজকাল আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তা পরিপাক ক'রে বাঙালী হয়তো আবার নূতন কোন সংস্কৃতি গ'ড়ে তুলবে, কারণ নূতন কিছু করার অগ্রণী চিরকাল এই বাঙালীরাই।

আমার বক্তব্য শেষ হ'ল। আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মেদিনীপুর শাখার ত্রি-চত্বারিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত ভাষণ

সংস্কৃতি কোন পথে

সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। সংস্কৃতি 'ফ্যাশন' নয়। একটা বিশেষ ধরণের পোষাক পরা, চুল দাড়ি ছাঁটা, বিশেষ কোন আহার বা পানীয়ে অনুরক্ত হওয়া, এমন কি মাঝে মাঝে আড়ম্বর ক'রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করাও সব সময়ে প্রকৃত সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। এগুলো এক-একটা বিশেষ যুগের বিশেষ সভ্যতার বহিরঙ্গ মাত্র। সংস্কৃতি কিন্তু সভ্যতার বহিরঙ্গ মাত্র নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার অন্তরের সুষ্ঠু বিকাশ। সুরুচি, শিক্ষা, ভদ্রতা, শালীনতা, সামাজিকতা, শ্রদ্ধা, প্রেম, মহত্ত্ব, বীরত্ব, আত্মত্যাগ এই সবই সংস্কৃতির উপকরণ। সংস্কৃতি জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি। সংস্কৃতির মূল স্বার্থপরতা নয় পরার্থপরতা, অহঙ্কার নয় বিনয়, তামসিকতা নয় আধ্যাত্মিকতা। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষ যে সংস্কৃতির ভিত্তি পত্তন করেছিল সে সংস্কৃতি যুগে যুগে নানারূপে অলঙ্কৃত হয়েছে, কিন্তু তার মূল-রূপটি এখনও ঠিক আছে এবং চিরকাল থাকবে। সভ্যতার অনেক সময় বিনাশ হয়, অন্ততঃ তার বহিরঙ্গের চেহারা বদলাতে দেরি হয় না, কিন্তু সংস্কৃতি অনেক দিন টিকে থাকে। একজন মানুষ অতি দ্রুত কৌপীন থেকে লুঙ্গী, লুঙ্গী থেকে কাপড় এবং কাপড় থেকে প্যাণ্টে নিজেকে সজ্জিত করতে পারে, কিন্তু অত সহজে বা অত দ্রুত সে নিজের সংস্কৃতি বদলাতে পাবে না। পশু-জগতের সংস্কারের মতো সভ্য মানুষের সংস্কৃতিও মর্মগত মজ্জাগত জিনিস। সহজে তা মরতে চায় না। কিন্তু একেবারেই তা যে অমর একথাও বলা যায় না। সভ্য মানুষ

অসভ্য হয়ে গেছে, পশুত্ব মনুষ্যত্বকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে এমন নিদর্শনও ইতিহাসে আছে।

কিন্তু তবু একথা সত্য যে সংস্কৃতি সহজে বিনষ্ট হয় না। সভ্যতার বাইরের জৌলুষ বহিরঙ্গের জাঁকজমক লুপ্ত হলেও এই সংস্কৃতি একটা জাতকে অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতি লোপ পেলে শুধু সভ্যতার বহিরঙ্গের আড়ম্বর দিয়ে একটা জাতকে বাঁচানো সম্ভব নয়। সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের শারীরিক উত্তাপের তুলনা দেওয়া চলে এক্ষেত্রে। নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেই শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। বাইরের উত্তাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে এই উত্তাপ শরীরে সঞ্চিত করবার অথবা শরীর থেকে বিকীর্ণ করবার উপায় আমাদের শরীরের নির্মাণ কৌশলের মধ্যেই বিদ্যমান। আমাদের যখন শীত করে তখন আমরা গরম কাপড় জামা পরি, আমাদের শীত নিবারিত হয় ; গরম কাপড় জামা কিন্তু উত্তাপ সৃষ্টি করে না, তারা শরীরের উত্তাপকে রক্ষা করে। অর্থাৎ গরম জামা কাপড় শরীরকে উত্তাপ সঞ্চয়ে সাহায্য করে মাত্র। আমাদের সভ্যতার বহিরঙ্গ এই গরম জামা কাপড়ের মতো। তা সংস্কৃতিকে রক্ষা করে। কিন্তু যদি গরম জামা কাপড় না থাকত ? আদিম অসভ্য মানুষদের জামা কাপড় ছিল না—তারা তো সবাই শীতে মরে যায় নি। সবাই ম'রে গেলে মনুষ্যজাতি বাঁচত না। আমাদের শরীরের মধ্যেই শীত নিবারণের কৌশল আছে, তারই জোরে আমরা জামা কাপড় না থাকলেও শীত থেকে খানিকটা বাঁচতে পারি। কিন্তু শরীরেই যদি তাপ সৃষ্টি না হয় তাহলে অতি মহার্ঘ শীতবস্ত্রও আমাদের শীতের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। ক্রমশ আমাদের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আমাদের মৃত্যু হবে। অতিশয় শীতের সময় অনেক সময় আমরা বাইরের উত্তাপের সহায়তা নিয়ে থাকি। রোদে বসি কিংবা আগুন জ্বালাই। তেমনি একটা জাতিও যখন নিজের সংস্কৃতির

জোরে টিকে থাকতে পারে না তখন বাইরের একটা সজীব সংস্কৃতির সাহায্যে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে। সব দেশের সব জাতির ইতিহাসেই এ ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দেশে তো ঘটেইছে। অনার্য, আর্য, ইসলাম, ইংরেজ এবং আধুনিক কালে সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের উপর একের পর এক নিজেদের সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করেছে এবং হয়তো আমাদের বারবার পুনরুজ্জীবিতও করেছে।

এদের সহায়তায় অনেক দুঃসময় আমরা পার হয়েছি কিংবা হব—কিন্তু তবু একটা কথা অতি অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির প্রাণশক্তি যদি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়, বাইরের উত্তাপও আমাদের বাঁচাতে পারবে না। মড়াকে বাইরের উত্তাপ দিয়ে জীবন-দান করা অসম্ভব। সংস্কৃতি যখন মৃতপ্রায় হয় তখন বাইরের কতকগুলো লক্ষণ থেকে তা বোঝা যায়। তখন সে জাতি বস্তুগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকেই একমাত্র কাম্য মনে করে। অর্থই তাদের কাছে পরমার্থ ব'লে গণ্য হয়। সে জাতির মধ্যে জ্ঞানী গুণীরা আদৃত হন না, হন ধনী বা ক্ষমতা দৃপ্ত রাজপুরুষরা। সে জাতির আত্মসম্মানবোধও ক্রমশঃ কমে আসে। সামান্য আধিভৌতিক সুবিধার জন্যও সে জাতি আত্মবিক্রয় করতে ইতস্ততঃ করে না। পরের ভাষা, পরের বেশ, পরের জীবন দর্শন অনুকরণ ক'রে তা আস্ফালন করতে পারলেই সে যেন নিজেকে ধন্য মনে করে। তুচ্ছ উপভোগই সে জাতির আনন্দের উৎস হয়। ছলে বলে কৌশলে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করাটাই সে জাতি বীরত্বের এবং বুদ্ধির নিদর্শন ব'লে মনে করে। তথাকথিত জ্ঞানী গুণীরাও সে সমাজে ভণ্ডামির মুখোশ প'রে মিথ্যা-ভাষণ করতে ইতস্ততঃ করেন না।

যদিও ইসলামী এবং ইংরেজি ছোঁয়াচ লেগেছে তবু ভারতীয় সংস্কৃতি প্রধানত আর্য সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শ রক্ষা
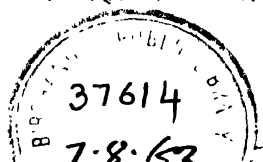
করতেন ব্রাহ্মণেরা। রবীন্দ্রনাথ এই ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গে বলেছেন—"সেই আদর্শকে কাহারা অটলভাবে রক্ষা করিতে পারে? যাহারা পুরুষানুক্রমে স্বার্থের সংঘর্ষ হইতে দূরে আছে, আর্থিক দারিদ্র্যেই যাহাদের প্রতিষ্ঠা, মঙ্গলকর্মকে যাহারা পণ্যদ্রব্যের মতো দেখে না, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উন্নত ধর্মের মধ্যে যাহাদের চিত্ত অভ্রভেদী হইয়া বিরাজ করে এবং অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া সমাজের উন্নততম আদর্শকে রক্ষা করিবার মহদ্ভাবই যাঁহাদিগকে পবিত্র ও পূজনীয় করিয়াছে···"

ইসলাম ধর্মে এবং ইংরেজ সমাজেও এরকম ব্রাহ্মণ আছেন, না থাকলে ওরা মরে যেত। ব্রাহ্মণরাই সব দেশে সব সমাজে সংস্কৃতির স্রষ্টিকর্তা এবং রক্ষক।

আমাদের দেশে আজকাল ব্রাহ্মণ নেই। 'বামুন' আছে, যারা পয়সার লোভে রান্না করে, পূজা করে এবং যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে দ্বিধামাত্র করে না। তাই আমাদের সংস্কৃতি ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। আমাদের এই সব বাহ্যিক আড়ম্বর যে আসলে পশুত্বেরই হুল্লোড় একথা বোঝবার সময় এসেছে। আমরা যদি সমাজে পুনরায় প্রকৃত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করতে না পারি, প্রকৃত ব্রাহ্মণকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হই, তাহলে আমাদের মুমূর্ষু সংস্কৃতির বাঁচবার আশা নেই। নাচগানের আসর বসিয়ে বা মেকি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভড়ং ক'রে তাকে বাঁচান যাবে না।

সংস্কৃতির সঙ্গে সাহিত্যের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ওরা যেন পরস্পরের পরিপূরক। একের অভাবে অপরের মৃত্যু হয়।

সাহিত্য এবং সংস্কৃতিই জাতির প্রাণকে সঞ্জীবিত রাখে। যে জাতির সাহিত্য নিকৃষ্ট এবং সংস্কৃতি মরণোন্মুখ সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আজ এ প্রশ্ন মনে স্বতঃই জাগছে আমাদের স্বাধীন ভারতে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি? যতটা দেখতে পাচ্ছি তাতে

আশার আলোক কিছু নেই। আমরা নিজেদের সংস্কৃতি ক্রমশঃ হারাচ্ছি, বিদেশাগত সংস্কৃতিও আমাদের বাঁচাতে পারছে না, কারণ সে সংস্কৃতিও নিঃস্ব। বিদেশের যে সংস্কৃতির আস্ফালন অহরহ শুনতে পাই তা পশুর গর্জন, সুসভ্য মানবতার সঙ্গীত নয়। আমাদের দেশে ভালো বইয়ের চাহিদা কম, যে-সব বইয়ের চাহিদা বেশী, তা হয় কোন রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা, না হয় লালসাউদ্দীপক। যে সব নাটক আজকাল জনপ্রিয় তা গভীরভাবে মনকে আলোড়িত করে না। ভাল ছবিও বেশী চলে না। সিনেমা ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার জন্যে যে-সব ছবি নির্মাণ করছেন সংস্কৃতির বাজারে তা অচল, কিন্তু সাধারণ দর্শকদের বাজারে তা খুব চলছে। সমাজের কোনও শৃঙ্খলা নেই, টাকার জোরে মনুষ্যত্ব অহরহ ক্রীত-বিক্রীত হচ্ছে। নারীরা অপমানিত, লাঞ্ছিত, কিন্তু এর কোন প্রতিকার নেই। আমরা এসব সহ্য করছি। কোনও সভায় গুণী বা বিদ্বান এলে ভীড় হয় না, কিন্তু সিনেমার অভিনেতা বা অভিনেত্রী এলে শহরের লোক ভেঙে পড়ে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ এখনও দু'চারজন আছেন, কিন্তু তাঁরা অবজ্ঞাত, অসম্মানিত। আজকাল সম্মানের শ্রেষ্ঠ দাবী যেনতেন-প্রকারে-ভোট-যুদ্ধ-জয়ী নেতাদের। চতুর্দিকেই আজকাল স্বেচ্ছাচার। আর ভয়ের কথা সে-সব আমরা সহ্য করছি। সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ কোনও সমাজ এ সব সহ্য করত না। তারা এর প্রতিকার খুঁজত, প্রয়োজন হলে বিদ্রোহ করত। আমরা মাঝে মাঝে নিষ্ফল বক্তৃতা করি হাততালি পাবার লোভে। এসব সুলক্ষণ নয়। তবু আমরা আশা ক'রে থাকব দুর্দিন কেটে যাবে। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চেষ্টা ক'রব "কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর—"

রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সঙ্কটে মুহ্যমান হয়ে শেষে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন আমাদেরও সেই বাণীর প্রতিই আস্থা রাখতে

হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল প্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে—"

আশা করব, আজ যারা ছাত্রছাত্রী তারাই এই জয়যাত্রায় দুরূহ অভিযানে যাত্রা করবে, তারাই আবার প্রতিষ্ঠা করবে সেই শাশ্বত সংস্কৃতির হর্ম যা আজ অমানুষদের অত্যাচারে ভেঙে যাচ্ছে। এই ছাত্রছাত্রীরাই আমাদের একমাত্র ভরসা-স্থল। তাদের প্রাণশক্তি নবীন, তাদের কল্পনা নবাঙ্কুরের মতো আকাশমুখী, দুঃসাধ্য সাধন করবার অমিত বীর্য সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো তাদেরই দেহে-মনে বিদ্যমান। কিন্তু এদের চরিত্র সুগঠিত ক'রে সুপথে চালিত করবার দায়িত্ব সমস্ত দেশের। স্কুল বা কলেজে পাঠ্যপুস্তকের পরিমিত বিদ্যা জোর করে গলাধঃকরণ করিয়ে পরীক্ষা পাশের শিরোপা দিলেই ছাত্রছাত্রীরা সম্যক মর্যাদা পাবে না, দেশকেও তারা পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারবে না। তাদের উচ্চ-আদর্শের পরিবেশে মানুষ করতে হবে। তবেই তারা দেশকে গৌরবান্বিত করতে পারবে। সে পরিবেশ কি আমাদের দেশে বর্তমানে আছে? নেই। আমাদের দেশে বর্তমান আদর্শ হচ্ছে—জোর যার মুলুক তার। টাকা যার দুনিয়া তার। এ আদর্শ ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমরা আজ যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অসংযম লক্ষ্য করছি তার মূল এইখানে। উদার এবং মহৎ আবেষ্টনীতেই উদারতা এবং মহত্ত্বের জন্ম হয়। সামাজিক পরিবেশ মনুষ্যত্ব-উদ্বোধনের অনুকূল না হ'লে মনুষ্যত্ব জাগবে না। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ভিত্তি-পত্তন হয় ঘরে পিতামাতার

কাছে সামাজিক পরিবেশে। পিতামাতার জীবনাদর্শ নির্মল নিষ্কলুষ না হলে, সামাজিক পরিবেশ স্বার্থ হিংসা ঘৃণার বিষ-বাষ্পে সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে ভালো ছেলে-মেয়ে হবে কি ক'রে? চোর চরিত্র-হীনের সমাজে চোর চরিত্রহীনেরই উদ্ভব স্বাভাবিক। সুতরাং সুস্থ সবল উজ্জ্বল সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ সমাজ সৃষ্টি করবার বাসনা যদি আমাদের থাকে তাহলে আমাদের নিজেদেরই প্রথমে সংশোধন করতে হবে। কেবল ছাত্রছাত্রীদের গালাগালি বা উপদেশ দিলে বা শিক্ষকদের সমালোচনা করলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমাদের আত্মানুসন্ধান করতে হবে, আমাদের নিজেদেরই নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে—আমি কি সুপুত্র বা সুকন্যা লাভের অধিকারী? আমি সত্যিই কি সভ্য সুসংস্কৃত সত্যনিষ্ঠ সমাজে বাস করতে চাই? যেদিন আমরা সকলেই এ সব প্রশ্নে সদুত্তর দিতে পারব সেদিনই আমাদের অন্ধকার আকাশে আলোকপাত হবে। এই ছাত্রছাত্রীরাই তখন উৎসাহী ভৃঙ্গের মতো পরিমল আহরণ ক'রে সৃষ্টি করবে নবযুগের অভিনব মধুচক্র।

আর একটা সম্ভাবনাও আছে। অত্যাচার অবিচার যখন চরমে ওঠে, অন্ধকার যখন সূচীভেদ্য হয়, আর্ত-আতুরের হাহাকার মহাকাশও যখন আর বহন করতে পারে না, সুসভ্য সংস্কৃতিকে মাৎস্যন্যায়ের ব্যায়ত আনন যখন সম্পূর্ণ-রূপে গ্রাস ক'রে ফেলে তখন অপ্রত্যাশিতভাবে ঐতিহাসিক প্রতিকার আসে মহাশূন্য থেকে। পঙ্ক থেকে পঙ্কজের আবির্ভাব হয়, বজ্রাহত বনস্পতির বিদীর্ণ কাণ্ডেও আত্মপ্রকাশ করে নবপল্লব, কংসের কারাগারে জন্মলাভ করেন শ্রীকৃষ্ণ। এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব তখন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধিত। তার উদ্যত দণ্ড তখন ধ্বংস করে অমঙ্গলকে।

আমরা স্বাভাবিক পন্থায় আমাদের মঙ্গলকে যদি আহ্বান ক'রে না আনতে পারি, তাহলে এই অপ্রত্যাশিত প্রতিকারের প্রতীক্ষায়

আমাদের থাকতে হবে। এ প্রতিকার আসবেই। অসত্য, অশিব, অসুন্দর চিরকাল রাজত্ব করতে পারে না। সত্য-শিব-সুন্দরই চিরন্তন, তার দ্যুতি সাময়িকভাবে ম্লান হতে পারে কিন্তু চিরকালের জন্য অস্তমিত হয় না।

কারণ, এই সংস্কৃতির ক্ষুধা মানুষের চিরন্তন ক্ষুধা—সামান্য অন্নে মেটে না, বস্তুতান্ত্রিক আড়ম্বরেও তার তৃপ্তি হয় না, এ ক্ষুধার তৃপ্তি সুধাতে। দানবরাও এ সুধার জন্য লালায়িত—এই সুধার জন্যই দেবাসুরে সমুদ্র-মন্থন করেছিল একদিন। সে সমুদ্রমন্থন চিরকাল চলছে, চিরকাল চলবে। সে মন্থনে আজ বিষ উঠেছে, কিন্তু অমৃতও উঠবে একথা যেন আমরা না ভুলি।

জামালপুরে জগজীবনরাম শ্রমিক কলেজে দেওয়া বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অংশ

নাট্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ আমাকে একবার লিখেছিলেন, সৃষ্টি-রংগ-লীলার সবচেয়ে কাছের জিনিস নাট্য-রংগ-লীলা। সৃষ্টিকর্তা যেমন নিজের সৃষ্টির ভিতর দিয়েই সার্থক ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন নাট্যকারের পক্ষেও তেমনি নিজেকে নিজের নাটকের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সুন্দর, শোভন এবং সার্থকভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের গোড়ার দিক থেকেই নাটকের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। কবিতা ও গানের পরই তাঁর নাটক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমালোচকেরা তাঁর নাটককে নানাভাবে ভাগ করেছেন—গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্য, সামাজিক নাটক, প্রহসন। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তত্ত্বনাট্য নাম দিয়ে তাঁর নাটকের আর একটা শ্রেণী বিভাগও করেছেন। বাহ্যিক নানা লক্ষণ ভেদে তাঁর নাটকের হয়তো আরও নানারকম শ্রেণী-বিভাগ করা সম্ভব। আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমি সে চেষ্টা করব না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নাটক বিষয়ে যে সামান্য আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম তাই লিখব। আমার 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি যখন ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই সেটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাঁর। নাটকটি যখন শেষ হ'ল তখন তিনি আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন শান্তিনিকেতনে। শ্রীমধুসূদন সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। আমার নাটকের দু'টি দোষ দেখালেন তিনি। মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাসের জীবন-চিত্র

দেখাবার জন্যে আমি স্বপ্নের সহায়তা নিয়েছিলাম। তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাক যেন স্বপ্ন দেখছেন যে, তিনি মাদ্রাজে গেছেন এবং তাঁর বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছেন। রবীন্দ্রনাথ এই স্বপ্নের ব্যাপারটায় আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, অমন একটা বাস্তব জীবনী-চিত্রের সঙ্গে স্বপ্নের অবতারণাটা গোঁজামিল হয়েছে। সমস্ত নাটকটাই যদি গৌরদাসের স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দেখাতে পারতে তাহলে সেটা একটা 'চীজ্' হ'ত। এই 'চীজ্' কথাটাই ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে পরে একটা চিঠিও লিখেছিলেন তিনি। তাতেও এই কথাই ছিল। চিঠিটা এখন হাতের কাছে নেই, থাকলে উদ্ধৃত ক'রে দিতাম। তখন ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বার্লেন বোধহয় জর্মানির সঙ্গে কি একটা রাজনৈতিক আপোষ করবার চেষ্টা করছিলেন। তার উল্লেখ ক'রে তিনি লিখেছিলেন—কোনও চেম্বার্লেন এই দু'টিকে (বাস্তব আর স্বপ্ন) একঘাটে জল খাওয়াতে পারবে না।

পরবর্তী সংস্করণে স্বপ্নের দৃশ্যটা আমি তুলে দিয়েছিলাম।

শ্রীমধুসূদন সম্পর্কে তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি ছিল শেষ দৃশ্য নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে মধুসূদনের ভৌতিক আবির্ভাব তিনি পছন্দ করেননি। আমাকে বললেন, ভূতটা ছাড়াতে হবে। সসংকোচে আমি চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর বললাম, মধুসূদনের জীবনের শেষ পরিণাম কি হয়েছিল তা তো সবাই জানে। সেটা শেষ দৃশ্য করলে কি ভালো হ'ত? ভূতে আপত্তি করছেন কেন, শেক্সপীয়রের মতো নাট্যকার তাঁর নাটকে ভূত এনেছেন। আমি তো মধুসূদনের জীবনচরিত লিখছি না, আমি নাটক লিখছি। শেষ দৃশ্যটা নাটকীয় হয়েছে কি না তাই বলুন—"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই প্রদীপ্ত দৃষ্টি আমার চোখের দিকে নিবদ্ধ ক'রে হাসলেন, তারপর বললেন, "তুমিও দেখছি আমারি মতো 'টাচি' (touchy), আচ্ছা, বিকেলে বলব, ওটা রাখা চলবে কি না।"

বিকেলে বললেন, "আচ্ছা ওটা যেমন আছে থাক।" তারপর একটু হেসে বললেন, "তুমি আমার কথা রাখলে না, কিন্তু আমি একজনের কথায় গোরার শেষটা বদলে দিয়েছিলাম।"

শুনে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম।

"গোরার শেষটা আগে কি রকম ছিল?"

"ছিল বিয়োগান্ত। যখন জানা গেল যে, গোরা সাহেবের ছেলে তখনও তার সুচরিতার সঙ্গে বিয়ে হয়নি। বিয়ে হবে এইটে ঠিক হয়ে আছে কেবল। নিদারুণ খবরটা প্রকাশ হওয়ার পর সুচরিতা এসে দেখল গোরা নিজের ঘরে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। সুচরিতা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—আমি আপনাকেই গুরুপদে বরণ করেছি। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব, যে-সত্য এখন প্রকাশ পেয়েছে তার আলোকে আমি এখন কি করব আপনিই ব'লে দিন। গোরা কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। সুচরিতা কয়েক মুহূর্ত ব'সে থেকে প্রণাম ক'রে উঠে চলে গেল। 'প্রবাসী'তে যখন উপন্যাসটা বেরুচ্ছিল তখন একটি মহিলা প্রতিমাসে সেটা তো পড়তই তারপর কতটা লেখা হ'ল তা জানবার জন্যেও আমার কাছে চ'লে আসত। সে এসে যখন দেখলে আমি এইভাবে শেষ কবছি তখন সে বললে—'না, না, এ রকম ভাবে আমি শেষ হ'তে দেব না। ওদের দুজনের মিলন আপনাকে করাতেই হবে। তার কথা রাখতে হল শেষ পর্যন্ত।"

এরপর নাটক সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা হয়েছিল। বলেছিলেন, সেকালের নাট্যকাররা চোখ-ভোলানো লোক-ভোলানো নাটক লিখতেন জনপ্রিয় হবার জন্য। থিয়েটার করা তাঁদের পেশা ছিল, নাটক জন-প্রিয় না হলে তাঁদের চলত না। এই জন্যেই তাঁরা মানুষের মনের মোটা মোটা ভাবকেই নাটকের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতেন। তীব্র প্রেম, ঘৃণা, প্রতিহিংসা

ভাঁড়ামি, সস্তা চটকদার নাচ-গান, এই সবই তাই তাঁরা নাটকের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করতেন। পৌরাণিক উপাখ্যানকেও নাটকের রূপ দেবার কারণ এই—লোকে সহজে বুঝতে পারবে, লোকের চিত্ত সহজে উদ্‌বুদ্ধ হবে। সূক্ষ্মভাবের সূক্ষ্ম কারুকার্য সাধারণত জন-প্রিয় হয় না। সূক্ষ্মভাবের রসিক কম। দেশের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগরিত ক'রে মানুষকে বৃহত্তর মুক্তির পথে চালিত করাও নাট্যকারের কাজ। কিন্তু সে কাজে অগ্রসর হওয়ার বিস্তর বাধা। এ ধরণের নাটক পেশাদার রঙ্গমঞ্চ অভিনয় করতেই চাইবে না। আমি এ পথে কিছু চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার জন্যে আমাকে নিজেই সব করতে হয়েছে, নিজের ষ্টেজ, নিজের দল, সব। জনসাধারণের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পাই নি।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার শেষ রক্ষা, চিরকুমার সভা তো খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, ওরকম বই আর লিখলেন না কেন?

হেসে বললেন, লেখাটা তো উনপঞ্চাশ বায়ুর লীলা। কখন কি যে এসে মাথায় ভর করে কিছু বলা যায় না। তাছাড়া একঘেয়ে জিনিস লিখতে ভালও লাগে না।

আমার 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটা যখন 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন সেটাও তিনি খুব আগ্রহ সহকারে পড়েছিলেন এবং আমাকে খুব উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির এক জায়গায় ছিল,—তোমার নাটক ঠিক লাইন ধ'রে চলছে। ডিরেলড্ হবার ভয় নেই। যে হতভাগাদের পাড়ায় ওর টার্মিনাস্ আচারে ব্যবহারে কথায় বার্তায় তাদের ঠিক ছবিটি তুমি ফুটিয়েছ। প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, ওদের তুমি চেন। আর্টে তুচ্ছতাই গৌরবান্বিত হয় তাদের যথার্থরূপে চিত্রিত করলে। এগুলো অবশ্য হুবহু রবীন্দ্রনাথের কথা নয়, তবে ভাবটা এই। এই চিঠিতে একথাও উনি লিখেছিলেন যে, তাঁর 'মুক্তির

উপায়' নাটকটি পাঁচজনের অনুরোধে প'ড়ে লিখতে হয়েছিল তাঁকে। নাটকটি লিখে তিনি তৃপ্তি পান নি। নাটকে যে চরিত্রগুলি এঁকেছেন সে চরিত্রগুলিকে যে তিনি যথার্থরূপে চেনেন তার সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই নাটকটিতে। যতদূর মনে পড়ছে লিখেছিলেন 'মাসিক পত্রের পাতায় মরা চ্যাপটা ব্যাঙের মতো দেখাবে।' আমার মনে হয়, এটা তাঁর অত্যুক্তি। তবে এই প্রসঙ্গে একটা ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়ঃ মনে হয়, সাধারণত যে স্তরের লোকদের নিয়ে আমাদের দেশে প্রহসন বা সামাজিক নাটক জমে সে স্তরের লোকদের সংগে ওঁর সম্যক পরিচয় বা অন্তরঙ্গতা ছিল না। তিনি তাঁর চতুর্দিকে যে মহিমময় পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রাখতেন তা স্বভাবতই তাঁকে নিঃসঙ্গ ক'রে রাখত। তাই তিনি যে সব নাটক লিখেছেন সে সবে মানুষের চেয়ে আদর্শই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই তাঁর নাটকে পাত্র-পাত্রীর চেয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত প্রেরণাই বড়। মানুষের নৈতিক দীনতাকে, নিষ্ঠুরতাকে, কুসংস্কারকে তিনি বার বার আঘাত করেছেন, মানবতাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন সত্য-শিব-সুন্দরের তীর্থে। অনেক রকম স্বপ্ন দেখেছেন তিনি নাটকের মাধ্যমে। তাঁর দু'একটা স্বপ্ন সফলও হয়েছে তাঁর জীবনে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটেছিল ধনঞ্জয় বৈরাগীর। তাই বোধহয় মহাত্মাজীকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকের সম্যক মর্যাদা আমরা এখনও দিতে পারি নি। এখনও অত্যন্ত সস্তা খেলো নাটকেই আমাদের রুচি নিবদ্ধ। পেশাদার নাটক-ব্যবসায়ীরা তাই নিয়েই কারবার করছেন এবং অত্যন্ত বাজে বইয়ের জনপ্রিয়তা দেখে রসিকরা আতংকিত হচ্ছেন।

এর কারণ দর্শকদের সুরুচি গ'ড়ে তোলবার কোনও ব্যাপক চেষ্টা আমাদের দেশে হয় নি। এ চেষ্টা করতে পারেন গভর্ণমেন্ট

কোনও ব্যক্তি-বিশেষ বা মুনাফা-প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠান-বিশেষের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। লাভ-ক্ষতির দিকে দৃষ্টি না রেখে এ কাজ একমাত্র গভর্ণমেণ্টের দ্বারাই সম্ভব। দেশের লোকের বুদ্ধিবৃত্তিকে, দেশের লোকের রুচির মানকে উন্নততর করতে হলে ভালো নাটকের অভিনয়, এক আধবার নয়, বার বার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলিতে অনেক ক্রান্তিকারী ভাব ও আদর্শ রেখে গেছেন। ক্রান্তিকারী ভাব ও আদর্শের মৃত্যু নেই। তারা time bomb-এর মতো অপেক্ষা ক'রে থাকে এবং যথাসময়ে তাদের বিস্ফোরণে দশ দিক সচকিত হয়ে ওঠে।

গভর্ণমেণ্ট মাত্রেই ক্রান্তিকারী আদর্শের শত্রু। জনসাধারণের উপর অবাধে প্রভুত্ব চালাবার সুযোগ কোনও গভর্ণমেণ্টই সহজে ছাড়তে চায় না। তাই মনে হয়, গভর্ণমেণ্ট বিদ্রোহী আত্ম-সম্মানী রবীন্দ্রনাথের প্রচারে কখনও সহায়ক হবে না। আমাদেরই উদ্যোগী হয়ে এ কাজ করতে হবে। ওদের দেশের জনসাধারণের চেষ্টাতে ইব্‌সেন, শেখভ, শ, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ নাটকজগতে আজ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। ওঁদের নাটক অভিনয় করবার জন্য নূতন ধরণের মঞ্চের পরিকল্পনা করতে ওঁরা পশ্চাৎপদ হন নি।

আশা করি, আমরাও হব না। রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে, আশা করি, আমরাও সগর্বে সার্থক রূপ দিতে পারব। আশা করি, আমরা মনে রাখতে পারব যে, মঞ্চের বাহ্যাড়ম্বরের চেয়ে আসল নাটকের মূল্য অনেক বেশী এবং সে নাটক খুন জখম, বাজে হাসি-হুল্লোড় বা সস্তা সেন্টিমেণ্টের বাহক নয়, তা নূতন যুগের নূতন মনের বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ, তার ইংগিত বন্ধনের দিকে নয়, মুক্তির দিকে।

ভাল বাংলা নাটক কেন নেই

বাংলা সাহিত্যে ভালো নাটক কেন রচিত হচ্ছে না এ নিয়ে কিছু লিখতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। ইতি পূর্বে আমি এ বিষয়ে দু'একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

সার্থক নাটকের সঙ্গে নাট্যমঞ্চ অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংশ্লিষ্ট। নাটক অভিনীত না হলে তা অসজ্জিতা অনলংকৃতা প্রতিমার মতো অসম্পূর্ণ অসার্থক সৃষ্টি হয়। নাট্যকার নাটকে যে রূপ ও রসের সমাবেশ করতে চান তার অনেকটা নির্ভর ক'রে তার অভিনয়ের উপর। লিখিত নাটক পাঠ ক'রে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার দশগুণ আনন্দ পাওয়া যায় সে নাটক সু-অভিনীত হলে।

পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশেই নাট্যসাহিত্য যখন সমৃদ্ধ হয়েছিল তখন নাট্যকার নাট্যমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অনেক সময় তাঁদের নিজেদেরই থিয়েটার ছিল, তাঁরাই সর্বেসর্বা মালিক ছিলেন সে সব থিয়েটারের। তাঁদের নাটকের সম্বন্ধে তাঁরা যা করতেন তাই হ'ত, বাইরের কোন বেরসিকের স্থূল হস্তাবলেপ তাঁরা সহ্য করতেন না। ম্যাক্‌বেথের প্রথম দৃশ্যটা বাদ দিয়ে দেওয়া হোক বা ওথেলো-ডেসডেমোনার পুনর্মিলন করালে নাটক বেশী 'পপুলার' হবে—এ ধরণের অশ্রদ্ধেয় ডেঁপোমি সেকালে কল্পনাতীত ছিল। নাট্যকারই তাঁর নাটকের প্রযোজক, আর্ট ডিরেক্‌টার, সব ছিলেন। তাঁরা রঙ্গমঞ্চের প্রসাধনের জন্য অনেক লোকের সাহায্য নিতেন অবশ্য, কিন্তু রাশটা থাকত তাঁদের হাতে। বাংলা নাটকের সমৃদ্ধির যুগেও নাট্যকারই রঙ্গমঞ্চের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, অমৃত লাল বসু, ক্ষীরোদ প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালই রঙ্গ-মঞ্চকে পরিচালনা করতেন, রঙ্গমঞ্চ তাঁদের শিল্প-বোধকে নিয়ন্ত্রিত

করত না, কিংবা তাঁদের নাটক অভিনয় ক'রে তাঁদের কৃতার্থ করছেন একথা আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করবারও সাহস পেত না। রবীন্দ্রনাথও নিজের নাটককে রূপ দেবার জন্য নিজের মতো ক'রে নিজের নাট্যসম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন, কোনও পেশাদারী নাট্যমঞ্চের দ্বারস্থ হন নি।

আজকাল কিন্তু পেশাদারী নাট্যমঞ্চের মালিকের দ্বারস্থ না হলে নাটক অভিনীত হয় না। উক্ত মালিক যদি সত্যিকারের রসিক, রসস্রষ্টা বা কীর্তিমান সাহিত্যিক হ'ন তাহলে তাঁর দ্বারস্থ হতে কোন নাট্য-শিল্পীর আপত্তি হবার কথা নয়, কিন্তু আজকাল সাধারণত নাট্যমঞ্চের যাঁরা মালিক হ'ন তাঁদের একমাত্র গুণ তাঁরা ধনবান, গুণী বা গুণীর সমঝদার নন। কোনও আত্মসম্মানী নাট্যকার এরকম লোকের 'দ্বারস্থ' হতে রাজী হবেন না। এর জন্যে তাঁর বিশেষ কোনও ক্ষতিও হবে না। কারণ যে সকল মূল উপাদান দিয়ে নাটক তৈরী হয় সেই সব উপাদান দিয়েই সৃষ্টি হয় উপন্যাস গল্প। তাই তাঁরা নাটক না লিখে গল্প উপন্যাস লেখেন। সে সবের চাহিদাও বাজারে কম নয়। নিজেকে অবনত ক'রে তাঁরা নাটক লিখতে যাবেন কেন? যদিই-বা কোনও প্রতিভাবান নাট্যকার আন্তরিক প্রেরণার তাগিদে নাটক লেখেন এই কারণেই তা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় না কখনও।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলির একমাত্র লক্ষ্য অর্থোপার্জন। জনমত গঠন করা বা জীবনের নব নব চেতনাকে রূপ দেওয়া অথবা সত্যি-কারের রসিক শ্রোতৃমণ্ডলী সৃষ্টি করা, এসব পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সাধ্যাতীত, হয়তো কল্পনারও অতীত। সুতরাং তাঁরা তাই করছেন যার 'মাস অ্যাপীল' আছে। উচ্চস্তরের নাটক অভিনয় করে তাঁরা রিস্‌ক নিতে রাজি নন। তাঁদের দোষ দিতে পারি না, কারণ তাঁরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিতে চান না, অনেক সময় নেবার ক্ষমতাও নেই। তাঁরা ব্যবসায়ী, বাংলা সাহিত্যের বা

নাট্যসাহিত্যের উন্নতি হচ্ছে কিনা তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। আর দুঃখের বিষয় এঁরাই বাংলা দেশের নাট্যসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করছেন।

আমাদের সরকার যদি প্রকৃত জাতীয় নাট্যশালা গঠনের দিকে মন দেন তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে প্রতিভাবান নাট্যকার এবং নটনটীরা উচ্চাঙ্গের নাটক দেখিয়ে নাট্য-রস পিপাসুদের তৃপ্ত করতে পারবেন, কিন্তু এখন সরকার যে ডান্স-ড্রামা একাডমী করেছেন তাতে একেবারে খোলাখুলিভাবে না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে তাঁরা চাইছেন যে নাট্যকাররা তাঁদের হয়ে তাঁদের সৎপ্রচেষ্টাগুলির প্রোপ্যাগাণ্ডা করুক। এরকম প্রোপ্যাগাণ্ডার হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নাট্যকাররা প্রচারক হতে রাজি হবেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং সরকার-লালিত রঙ্গমঞ্চেও ভালো নাটক অভিনীত হবার আশা নেই।

যদি কোনও প্রতিভাবান নাট্যকারকে কেন্দ্র ক'রে কোনও নাট্যসম্প্রদায় গড়ে ওঠে এবং সে সম্প্রদায়ে নাট্যকারের যদি শ্রদ্ধার আসন থাকে তাহলেই ভালো নাটক হবার আশা আছে বলে মনে হয়।

আমাদের দেশে অনেক প্রতিভাবান অভিনেতা এবং প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী আছেন। তাঁদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়, কিন্তু নাটক ভালো নেই। এর আসল কারণ নাট্যসম্প্রদায়ে নাট্যকারের কদর নেই। অপরের লেখা কোনো ভালো নাটক কিছুটা অদল-বদল ক'রে (অর্থাৎ তার থেকে চুরি ক'রে), বিদেশী বইয়ের ব্যর্থ নকল ক'রে উপন্যাসকে ভেঙ্গে-চুরে যে সব নাটক আজকাল মঞ্চস্থ হচ্ছে সেগুলি দিয়ে পয়সা রোজগার হতে পারে ; সেগুলি ভালো নাটক নয় একথা রসিকমাত্রেই স্বীকার করবেন। বাংলা দেশে নাট্যামোদী অনেক আছেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যে সম্ভ্রমপূর্ণ সশ্রদ্ধ ব্যবহার

করলে তাঁরা নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন সেইটেরই অভাব আছে ব'লে আমার মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব-উপলক্ষে এই কথাটিই বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের মতো মহামানবের জন্মদিন একটিমাত্র নহে, তিনি একই জীবনে নব-নব রূপে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি বিদগ্ধসমাজে বিস্ময়-ভাজন। ১৭৮৩ সংবতে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে বৈশাখ কলিকাতা শহরে আরও অনেক মানবশিশু নিশ্চয় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কথা আমরা এমন ব্যাপকভাবে স্মরণ করি না। যে দিব্যপ্রতিভার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার সমুচ্চ আসনে বসাইয়া অভিনন্দিত করিয়া থাকি, সেই প্রতিভার প্রথম প্রকাশ যেদিন হইয়াছিল—সেই দিনই রসিক সমাজে রবীন্দ্র-নাথের প্রথম জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কাব্য-প্রতিভা ঠিক কবে স্ফুরিত হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব। 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"কোন একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেনসিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম"—তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর। কবি-কীর্তি তখন কবির জামার পকেটেই নিবদ্ধ। তিনি নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, আর দাদা সোমেন্দ্রনাথ উৎসাহী সমঝদার ও বিজ্ঞাপন-দাতা। তখনকার ন্যাশন্যাল পেপারের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ও তাঁহার সে-সময়কার

লেখা পদ্ম-বিষয়ক কবিতাটি শুনিয়াছিলেন এবং তাহাতে কবি 'ভ্রমরের' পরিবর্তে 'দ্বিরেফ' শব্দ ব্যবহার করাতে একটু কৌতুক-বোধও করিয়াছিলেন।

এই নীলখাতায় লেখা কবিতাগুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য-চর্চার নিদর্শন হিসাবে গ্রাহ্য হইতে পারিত যদি সেগুলির প্রথম আবির্ভাবকালের সন-তারিখ আমরা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিতাম ; কিন্তু তাহা জানিবার উপায় নাই, কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছেন—"সেই নীল ফুলস্ক্যাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তি দেবী কবে কোন্ বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা, তাহার ভব-ভয় আর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের জঠর-যন্ত্রণার হাত সে এড়াইল" ; সেই-জন্য দলিল হিসাবে এই লেখাগুলির মূল্য দিতে ঐতিহাসিকেরা ইতস্তত করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম যে কবিতাটি ছাপার অক্ষরে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল তাহার বিবরণ গবেষকেরা সংগ্রহ করিয়াছেন। কবিতাটির নাম 'অভিলাষ'। কবিতাটি ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দলিল হিসাবে ইহাতেও একটু খুঁত আছে, কারণ কবিতার নীচে রবীন্দ্রনাথের নাম ছাপা হয় নাই। লেখা ছিল দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরে অবশ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন কবিতাটি তাঁহার লেখা ; সুতরাং বাংলা সাহিত্যে এই তারিখটিকেই কবির প্রথম জন্মদিন বলা যাইতে পারে। ছাপার অক্ষরে এইটিই তাঁহার প্রথম কবিতা। কবিতাটি দীর্ঘ। চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচার-চয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুতপদে
তোমার মোহন-জালে পড়িবার তরে।
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।"

আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি তাঁহার অন্তিম রচনা তাহাতেও অনেকটা এই সুর বাজিয়াছে—

"তোমার সৃষ্টি পথ রেখেছে আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা-জালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত···"

ছাপার অক্ষরে তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা-পুস্তক 'কবি-কাহিনী'। এ পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সংবতে, ইংরেজী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পাঁচই নভেম্বর তারিখে। গ্রন্থকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম আবির্ভাবের দিনটিকেও তাঁহার জন্মদিন বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি হইয়াছিল নোবেল প্রাইজ পাইবার পর। পাশ্চাত্য দেশই রবীন্দ্রনাথকে সে সম্মান দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম কাব্য-গ্রন্থখানিও একটি পাশ্চাত্য মহিলাকে মুগ্ধ করে। তাঁহার নাম অ্যানা টারখুদ। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পত্রে লিখিতেছেন—"I have had it read and translated to me, till I know the poem almost by heart."

'কবি-কাহিনী'তে আরম্ভ হইয়া তাঁহার কল্পনা-প্রবাহ নব নব বিস্ময়সৃষ্টি করিয়াছে, কিছুদিন অন্তর অন্তর তাহা দিক-পরিবর্তন করিয়াছে, রূপও পরিবর্তন করিয়াছে, 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতের' কবিতার সহিত 'নৈবেদ্য', 'সোনার তরী', 'ক্ষণিকা' বা 'বলাকা'র কবিতার অনেক পার্থক্য, এইগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলেও কবির আরও নব নব জন্মদিনের সন্ধান পাওয়া যাইবে, কিন্তু আমি আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহার ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি নাই। সাহিত্যের যে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজের অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সেই

ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম আবির্ভাবের তারিখগুলিকেই আমি এই নিবন্ধে সংগ্রহ করিয়াছি।

এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আর-এক জন্মতারিখ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে। যে পত্র-সাহিত্য রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে সেই পত্র-সাহিত্যের প্রথম পুস্তক 'য়ুরোপযাত্রীর পত্র' এই সময় প্রকাশিত হয়। ছাপার অক্ষরে ইহাই অবশ্য তাঁহার প্রথম গদ্যরচনা নহে, তাঁহার প্রথম গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায়। প্রবন্ধটি একটি সমালোচনা '—ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'।

বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ২৫শে জুন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ, শকাব্দ ১৮০৩। এই তারিখে তাঁহার প্রথম নাটক 'রুদ্রচণ্ড' প্রকাশিত হয়। যে নাট্যকারের লেখনী হইতে পরে বহু বিস্ময়কর নাটক বাহির হইয়াছে তাঁহার জন্ম মানুষ রবীন্দ্রনাথের জন্মের কুড়ি বৎসর পরে। ইহার দুই বৎসর পরে আর-এক রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হইলেন, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তারিখে। 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতির লেখক ওই বিশেষ দিনে বাংলা-সাহিত্য-সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার আর-এক জন্মদিবস। ইহার কিছকাল পরে ১৮০৫ শকের বৈশাখ মাসে তাঁহার 'প্রভাত সঙ্গীত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের একটি কবিতা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। এই কাব্যগ্রন্থে কবি যেন আর-এক নবজন্ম লাভ করিলেন। তাঁহার এই সময়কার মনের ভাব নিজেই তিনি 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়া গিয়াছেন—তখন তিনি সদর স্ট্রীটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট থাকিতেন। লিখিয়াছেন —"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে

বোধকরি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছ-গুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একমুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিলাম। একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়-স্ফূর্তির দিনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমাব সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে…”

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের শেষের কয়েকটি ছত্র—

“আমি যাব আমি যাব কোথায় সে কোন্ দেশ
জগতে ঢালিব প্রাণ
গাহিব করুণা গান
উদ্বেগ অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর
এ-কী কারাগার ঘোর
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা আঘাতে আঘাত কর্
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখী
এসেছে রবির কর।”

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এক নবজন্ম লাভ করিয়াছেন। যে বিশ্ব-প্রেম, যে ভূমার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পরবর্তী কাব্য-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ‘প্রভাত-সঙ্গীত’ কাব্যেই তাহার প্রথম সূচনা।

সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই রবীন্দ্রনাথকে কোন না কোন সাময়িকপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে হইয়াছিল বলিয়াই সম্ভবত প্রায় একই কালে তাঁহাকে নানা ধরনের লেখা লিখিতে হইয়াছে। ওই ১৮০৫ শকের ভাদ্র মাসে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধপুস্তক 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে বাহির হয়। প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম আবির্ভাব। প্রবন্ধগুলি ১২৮৮-৮৯ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তেমন গুরুত্ব দেন নাই। এগুলির সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এ-ও সেইরকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোট ছোট স্বল্পায়ু রঙীন ভাবনা উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেই-গুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল।...মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার উত্তেজনা..." এ পুস্তকের আর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "—প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।" ইতিহাসের দৃষ্টিতে কিন্তু প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব অনেক, কারণ প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব এইগুলিতেই।

১২৯১ সালে, ইংরেজী ১লা জুলাই ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আর এক নূতন সুর ঝঙ্কৃত হইল ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে। ইহাতে তাঁহার আর-এক নবজন্ম।

'প্রভাত-সঙ্গীতের' কবিতার নমুনা—

"এখনো সে মনে আছে সেই জানালার কাছে
বসে থাকিতাম একা জনহীন দ্বিপ্রহরে
অনন্ত আকাশ নীল ডেকে চলে যেত চিল
জানায়ে সুতীব্র তৃষা সুতীক্ষ্ণ করুণ স্বরে"

ভানুসিংহ ঠাকুর গাহিলেন—

"বসন্ত আওল রে
মধুকর গুন গুন অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।"

একেবারে অন্য সুর। এ যেন রবীন্দ্রনাথ নয়, বিদ্যাপতি।

ইহার পরেই বাঙালী রসিক-সমাজ রবীন্দ্রনাথকে আর এক নূতন মূর্তিতে দেখিতে পাইলেন—'রাজা রামমোহন রায়' নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮ই মার্চ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। জীবনচরিতকার রবীন্দ্রনাথ, চারিত্রপূজার রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব ওই প্রবন্ধে।

ইহার কিছুদিন পরেই আমরা আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। তিনি আবার নবজন্ম লাভ করিলেন যেন। জালিওয়ানবালাবাগে ইংরেজদের পাশবিক হত্যাকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ হইয়া পরে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঐতিহাসিক পত্রখানি লিখিয়া 'সার' উপাধি বর্জন করেন সেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রথমে দেখিলাম ২রা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সালে—যেদিন তিনি এমারেল্ড নাট্যশালার এক জনসভায় 'মন্ত্রী-অভিষেক' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। লর্ড ক্রসের বিল-এর বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ উপলক্ষে এই সভা আহূত হইয়াছিল। এই রবীন্দ্রনাথই পরে কারারুদ্ধ জওহরলালের হইয়া এক বিদেশিনী মহিলাকে তীব্র জবাব দিয়াছিলেন। এ রবীন্দ্রনাথ একেবারে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইহার বর্ণনা শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমল হোম তাঁহার 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "স্বদেশের অপমান-বেদনা, দুর্গতি-লাঞ্ছনা, তীব্র অনুভূতিতে মর্ম-জ্বালায় রবীন্দ্রনাথকে বার বার যেমন ক্ষুব্ধ করেছে, প্রত্যেক সঙ্কটকালে তিনি যেভাবে তাঁর স্বদেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তার তুলনা আর কোনো দেশের আর কোনো কবির জীবনে পাওয়া যায় কিনা জানি না..."

উক্ত 'মন্ত্রী-অভিষেক' নামক প্রবন্ধে তাঁহার রাজনৈতিক মতও ব্যক্ত হইয়াছে; এই মত তিনি আজীবন পোষণ করিয়াছেন, স্বদেশ ও স্বাধীনতা বিষয়ক তাঁহার নানা প্রবন্ধে বারম্বার তাহা ঘোষণাও করিয়াছেন। তাঁহার সে মতটি এই যে—স্বাধীনতা নিজে অর্জন করিতে হয়, তাহা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, কোনও ফাঁকি, কোনও মন্ত্র, কোনও বিশেষ হুজুকের আস্ফালন-আতিশয্যে তাহাকে পাওয়া যায় না। তাঁর শেষ-জীবনে লিখিত একটি প্রবন্ধেও তিনি বলিয়াছেন—"আমি বিশেষ করে এবং বার বার করে বলেছি যে ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকলপ্রকার হিতকর দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হ'তেই পারে না। সরকার-বাহাদুর নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাব নিবারণের আর কোন উপায় আমাদের হাতে নেই, এইরকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হ'তে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে যথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয়নি তার প্রধান কারণ এ নয়, যে এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে যে-দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলিনি: একে অধিকার করতে পারিনি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রেম দিয়ে প্রাণ দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি···"

এ রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব উক্ত 'মন্ত্রী-অভিষেক' প্রবন্ধে ২রা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সালে।

ইহার প্রায় বছর দুই পরে রবীন্দ্রনাথের আবার এক নবজন্ম হইল। ১২৯৯ সালে ২৮শে ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত চিত্রাঙ্গদা কাব্যে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ আর-এক নূতন মূর্তিতে দেখিয়া বঙ্গ-

ভারতী আনন্দিত হইলেন। যে আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য রচনা করিয়াছেন সেই আঙ্গিক তাঁহার আরও অনেক বিখ্যাত কবিতায় অনুসৃত হইয়াছে। বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যে আর-একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ সেই কথা বলিয়াছেন। দয়িতা দয়িতের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্যই উন্মুখ। কিন্তু নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে উংসর্গ করা তখনই সার্থক হয় যখন সে সত্তা সর্ব-আবরণ সর্ব-আভরণ মুক্ত; কোন কিছুর আড়াল, রূপের আড়াল এমন কি দেহের আড়ালও মিলনকে ব্যাহত করে। এইজন্যই শ্রীরাধা কামনা করিয়াছিলেন—পরজন্মে যেন পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার আর কোন বাধা থাকিবে না। চিত্রাঙ্গদা কাব্যে আর-একটি সুরও বাজিয়াছে যাহা রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সুর। এই কাব্যে সর্বপ্রথম তিনি নারীকে তাহার স্বকীয় মর্যাদায় মহিমময়ী করিয়াছেন। শেষদৃশ্যে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলিতেছে—

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

পরে এই সুর রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্যে বাজিয়াছে, কিন্তু এই কাব্যেই তাহার প্রথম সুষ্ঠু প্রকাশ।

ইহার কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের আর-এক অপ্রত্যাশিত-পূর্ব আবির্ভাব ঘটিল। বিখ্যাত প্রহসন 'গোড়ায় গলদ' প্রকাশিত হইল ৩১শে ভাদ্র ১২৯৯ সালে। হিউমার (humour) আর উইট (wit) রবীন্দ্রনাথের রচনার এবং চরিত্রের একটি সুমধুর দিক। বঙ্কিমচন্দ্রের পর তিনিই বাংলা সাহিত্যকে সুমার্জিত হিউমার এবং উইট দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। গোড়ায় গলদে হিউমারিস্ট রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব। ইহাও তাঁহার আর-এক জন্মদিন। এই 'গোড়ায় গলদ' পরে 'শেষরক্ষা'য় রূপান্তরিত হইয়াছে।

ইহার কয়েকমাস পরেই রবীন্দ্র-প্রতিভার আর-এক নূতন প্রকাশ বঙ্গসাহিত্য-আকাশকে উদ্ভাসিত করিল। ১৫ই ফাল্গুন ১৩০০ সালে তাঁহার প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ছোট-গল্প' প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথের এ আবির্ভাবও সম্পূর্ণ অভিনব। বাংলা সাহিত্যে ওই তারিখটিকেও রবীন্দ্রনাথের আর-একটি জন্মদিন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বাংলা সাহিত্য যে ছোট-গল্পের গৌরবে আজ পৃথিবীর যে-কোনও সাহিত্যের সমকক্ষ, সেই ছোট গল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

ইহার বছর দুই পরে—২২শে মাঘ ১৩০২ সালে—রবীন্দ্রনাথের আর-একটি জন্মতারিখ পাইতেছি। উক্ত তারিখে বালক-বালিকাদের পাঠের জন্য তিনি 'নদী' নামক কাব্যগ্রন্থ লইয়া সাহিত্য-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান যে কত তাহা সুধী-সমাজে অবিদিত নাই। শুধু মনোরঞ্জনের জন্য নহে, তাহাদের শিক্ষার জন্যও তিনি অনেক পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছেন—সংস্কৃত-শিক্ষা, ইংরেজি-সোপান, ইংরেজি-পাঠ, ছুটির পড়া, অনুবাদ-চর্চা, পাঠ-প্রচয়, সহজ পাঠ প্রভৃতি পুস্তক শান্তিনিকেতনের বিদ্যাভবনে সুপরিচিত। শিশুদের মনোরঞ্জনের

জন্যও তাঁহার পুস্তকসংখ্যা অনেক। এই শিশু-সাহিত্যে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব ২২শে মাঘ, ১৩০২ সাল।

ইহার কিছুদিন পরে ১৩০৪ সালে প্রকাশিত হইল 'পঞ্চভূত'। ইহা একটি অদ্ভুত এবং অপূর্ব রচনা। এই রচনার তারিখকেও এক নব-রবীন্দ্রনাথের জন্মতারিখ বলিতে পারি।

১৩০৬ সালে ৪ঠা অগ্রহায়ণ 'কণিকা' প্রকাশিত হয়। ইহাতে আর-এক রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ আমরা পাই। ইহারই গদ্য-রূপ 'লিপিকা' অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতিক্ষুদ্রের মধ্যে অতি-বৃহৎকে অপরূপ শিল্প-সুষমায় প্রকাশ করিবার নিদর্শন এই বই-দুটি। সংস্কৃত শ্লোকে এই নৈপুণ্য দেখিতে পাই। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই ইহা প্রথম প্রবর্তন করিলেন। এই পুস্তক প্রকাশ-কালও রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

এই ১৩০৬ সালেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা আরও দুই বিভিন্ন স্রষ্টারূপে পাইয়াছি। ১৩০৬ সালে ১লা মাঘ প্রকাশিত হয় 'কথা', ৭ই মাঘ 'ব্রহ্মোপনিষদ' এবং ২৪শে ফাল্গুন 'কাহিনী'।

'কথা' ও 'কাহিনী' রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্য হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। ইংরেজীতে যাহাকে Ballad বলে, এগুলি সেইজাতীয় কবিতা। রবীন্দ্রনাথই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রহ্মোপনিষদ ছাপার অক্ষরে উপনিষদ-মুগ্ধ ভক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম আত্মপ্রকাশ। উপনিষদের বাণীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের চরিত্র ও সাহিত্যে সুস্পষ্ট। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি বহু কবিতা, বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন; বস্তুত উপনিষদই রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরাট ভিত্তি-ভূমির একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে। সমগ্র 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থমালাই তাঁহার এই উপলব্ধির বিচিত্র শিল্প-সৌধ। ব্রহ্মোপনিষদ গ্রন্থে এই শিল্পীর প্রথম

আবির্ভাব। সুতরাং ১৩০৬ সালেই রবীন্দ্রনাথ দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আমি এই নিবন্ধে যে দৃষ্টিকোণ হইতে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনকে দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছি, সে দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে আরও অনেকগুলি জন্মদিনের সন্ধান আমরা পাইতে পারি।

স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব ১৩১২ সালে তাহার 'স্বদেশ' নামক কাব্য-গ্রন্থে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন তাঁহার 'সমালোচনা' নামক পুস্তকে ১২৯১ সালে ১লা জুলাই ১৮৮৪। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি ভাষা-বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে প্রথম দেখা দিলেন তাঁহার 'শব্দতত্ত্ব' নামক পুস্তকে। যে রবীন্দ্রনাথ পরে 'ছন্দ' ও 'বাংলাভাষা পরিচয়' লিখিয়াছেন তিনি প্রথম জন্মগ্রহণ করিলেন উক্ত 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে। শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রথম দেখিতে পাই তাঁহার 'শিক্ষা' নামক পুস্তকে—১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ নভেম্বর তারিখে। এই বিষয়ে তিনি পরে আরও অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেনঃ 'শিক্ষার মিলন' (১৪ আগস্ট, ১৯২১), বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (জানুয়ারি, ১৯৩৩) 'শিক্ষার বিকিরণ' (মে, ১৯৩৩), শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬)।

ইহা ছাড়া গায়ক রবীন্দ্রনাথ, সুরকার রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ, অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, রাজনীতি-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, সমাজ-সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ, বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, বিশ্ব-ভারতীর রবীন্দ্রনাথ, শ্রীনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ, পথিক রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী রবীন্দ্রনাথ, সাধক রবীন্দ্রনাথ—প্রত্যেকেই কবি রবীন্দ্রনাথের এক একটি বিভিন্ন প্রকাশ, বিভিন্ন সত্তা। প্রত্যেক সত্তারই বিশিষ্ট রূপ আছে, জন্মদিনও আছে। বিশ্বকবি, পুরুষোত্তম, আধুনিক ভারতের দিক্‌পাল, বঙ্গ-সাহিত্যে একাধিক যুগের প্রবর্তক, বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভাদীপ্ত রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

একটিমাত্র নহে। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহুবার নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া নব-নব-রূপে আমাদের বিস্মিত করিয়াছেন।

একই জল যেমন কখনও পানীয় রূপে, কখনও স্নানীয় রূপে, কখনও আকাশের মেঘে, কখনও কুজ্‌ঝটিকায়, কখনও ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে, কখনও হিমানীর শুভ্রতায়, কখনও কম্পমান শিশিরবিন্দুতে কখনও নির্ঝরের কলোল্লাসে, কখনও স্রোতস্বিনীর খরবেগে, কখনও দিগন্ত পরিব্যাপ্ত সমুদ্রের উদার গাম্ভীর্যে পৃথিবীর লীলারঙ্গমঞ্চে প্রকাশিত—তাহা কখনও যেমন আকাশব্যাপী, কখনও পর্বতচূড়ালগ্ন, কখনও ভূতল-নিবদ্ধ—রবীন্দ্র-প্রতিভাও অনেকটা তেমন; তাহার নানা প্রকাশ, নানা আবেদন, নানা পরিবেশ। আমরা এ যুগে তাঁহাকে যে রূপে দেখিতেছি, হয়তো যুগান্তরে সে রূপ পরিবর্তিত হইবে। নূতন যুগের মানুষেরা তাঁহাকে নূতন রূপে দেখিয়া নূতন ভাবে মুগ্ধ হইবে, নূতন ভাষায় তাঁহার কাব্যের নূতন ভাষ্য রচনা করিবে। কারণ কবির কাব্যে মানুষ আত্ম-আবিষ্কার করে। এক যুগের আত্ম-আবিষ্কারের সঙ্গে আর-এক যুগের আত্ম-আবিষ্কারের মিল থাকে না; কিন্তু কবি চিরদিনই সঙ্গে থাকেন, তাঁহারই প্রতিভার আলোকে আমরা আমাদের স্বরূপ আবিষ্কার করি। কিছুদিন পূর্বে এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব।—

আকাশে আকাশে নিত্যকালের যে অভিযান
কুসুমে কুসুমে যাহার স্বপন গন্ধ-ভরা
যে মহা-গান
সূর্য-তারার ছন্দ ভরা
স্মরণ-সভায় জানি না তাহার কোথায় স্থান
হায়রে, ব্যাকুল বসুন্ধরা।

তোমার চোখের জলেতে লেগেছে তাহারই রং
তোমার শোকের ভাষায় শুনি যে ছন্দ তার,

সেই সারং
কাঁপায় রৌদ্র অন্ধকার,
উজ্জ্বল রবি উজ্জ্বলতর হয় বরং
হয়নি যাত্রা বন্ধ তার।
গঙ্গার কূলে জ্বলেনি জ্বলেনি তাহার চিতা
সন্ধ্যার বুকে জ্বলেছিল শুধু সূর্য-জ্বালা
রূপের গীতা
শেষ করেছে যে একটি পালা
নিত্যকালের আকাশে ওই যে দীপান্বিতা
সাজায় তাহার দীপালি-মালা।
নিত্যকালের মাটিতে ওই যে শ্যামলী বালা
তাহারই পথেতে পাতিয়া রেখেছে চোখের চাওয়া
ফুলের মালা
দুলায় বুকেতে দখিন হাওয়া
তাহারি লাগিয়া গভীর নিশীথে প্রদীপ জ্বালা
নিবিড় ছায়াতে দিবস ছাওয়া।

এই প্রবন্ধে উল্লিখিত তারিখগুলি স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। বিশ্বব্যাপী যে উৎসবে আজ আমাদের কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হইতেছে সে উৎসবে যোগদান করিতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ আজ সমস্ত পার্থিব প্রয়োজনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, নিজের সুমহতী কীর্তির অমরাবতীতে তিনি আজ প্রতিষ্ঠিত—এ সব উৎসবে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাদের আছে। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে আমরাই উপকৃত হইব, আমরাই আনন্দিত হইব, আমাদেরই মনুষ্য-দেহাশ্রয়ী পশুত্ব হয়তো প্রকৃত মনুষ্যত্বের কিছু আস্বাদ পাইয়া আত্মসচেতন হইয়া উঠিবে। এই প্রয়োজনই এখন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাব আছে, আমাদের বেকার-সমস্যার সমাধান হয় নাই, আমাদের দেশের অনেক জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফসল ফলানো প্রয়োজন, বাণিজ্য-ব্যবসায় ও স্বদেশী উৎপাদনের বহুক্ষেত্রে এখনও আমরা স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি নাই, আমাদের অভাব অনেক, প্রয়োজনও অনেক ; কিন্তু আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভাব মনুষ্যত্বের, আমাদের সমধিক প্রয়োজন মনুষ্যত্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। শঙ্করাচার্য, বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের দেশে এখনও মনুষ্যবেশধারী পশুর সংখ্যা অগণিত। এই পশু-মানবের দল যে আধুনিক যুগেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নয়। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে রোমাঞ্চকর পাশবিকতার অনেক উদাহরণ মিলিবে। এই পশুত্বের রঙটা খুব পাকা, প্রকৃতির সৃষ্টিরক্ষার সহিতও ইহার

ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তাই ইহা সহজে আমাদের স্বভাব হইতে লোপ পায় না। অবশ্য একমাত্র মানুষই এই পশুত্বের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চায়, এই মুক্তিরই সে নাম দিয়াছে সভ্যতা। যাহারা সত্যসত্যই পশু, এ বিষয়ে তাহাদের কোন আগ্রহ নাই। মানুষদের মধ্যে এ বিষয়ে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহশীল, আমাদের অভিধানে তাঁহাদের অনেক নাম। সাধু, তপস্বী, ঋষি, মহাপুরুষ, যোগী প্রভৃতি অনেক নামেই তাঁহারা পরিচিত, কিন্তু প্রাচীন যুগে, বিশেষ করিয়া উপনিষদের যুগে তাঁহাদের আর এক নাম ছিল কবি। যাঁহাদের উপনিষদের সহিত কিঞ্চিৎমাত্রও পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন যে কবি এবং ব্রহ্মবিৎ তাঁহাদের কাছে সমার্থক ছিল। ব্রহ্মকে তাঁহারা রসো বৈ সঃ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রস তাঁহাদের সংজ্ঞায় ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর, কবিও তাই তাঁহাদের বিচারে ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মদর্শী। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মূলতঃ তিনি কবি ছিলেন, ব্রহ্মোপলব্ধির বিচিত্র লীলা, সীমার মাঝে অসীমের আবির্ভাব, তাঁহার বিরাট সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে নানাভাবে নানাছন্দে নানা রূপ-ভঙ্গিমায় রসিক পাঠক-সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতায়, গানে, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসে যে কথাটি তিনি বারংবার নিত্য নূতন সুরে বলিয়াছেন সে কথাটি এই—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর, ধন্য হল অঙ্গ মম, পুণ্য হল অন্তর'। যে অরূপ-রতনের আশায় তিনি বারংবার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন সে অরূপ-রতনের দিব্যদ্যুতিতে বঙ্গবাণীর মন্দির আজ আলোকিত, সে আলোক আজ বিশ্ববাণীর মন্দিরকেও উজ্জ্বল করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের বাণী আজ বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের বাণী। সে বাণীর অন্তর্নিহিত মন্ত্র চিরন্তনের সুরে বাঁধা, বিরাট ভূমার অফুরন্ত আমন্ত্রণে সে বাণী চির-অভিসারিকা। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে যাহার যাত্রা শুরু হইয়াছিল

সে যাত্রা কোথাও থামিয়া যায় নাই, তাহা অশেষ, তাহা চির-প্রসারিত, যাত্রা-পথের বাঁকে বাঁকে তাহা নিত্যনূতন শোভায় বিস্মিত, আনন্দিত, অভিভূত। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি—

আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা
কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খল খল গেয়ে কল কল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে প্রাণ হয়ে আছে ভোর।
কী জানি কী হ'ল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

—প্রভাত সঙ্গীত

* * *

একখানি ছোট ক্ষেত, আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা
পরপারে দেখি আঁকা তরু-ছায়া মসী মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা॥

—সোনার তরী

*　　　　*　　　　*

ওগো পবনে গগনে সাগরে আজিকে কী কল্লোল
দে দোল দোল।
পশ্চাৎ হতে হা হা করে হাসি
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি
যেন সে লক্ষ যক্ষ শিশুর অট্টরোল
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে হট্টগোল
দে দোল দোল।

—সোনার তরী

*　　　　*　　　　*

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া পথখানি ছায়া করা
ছেয়ে গেছে ঝরে, পড়া বকুলে
সারি সারি নিকেতন, বেড়া-দেওয়া উপবন
দেখে পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

—চিত্রা

*　　　　*　　　　*

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহ-বন্ধন
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা দিশা-হারা নিবিড় তিমির আঁকা
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

—কল্পনা

*   *   *

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

—উৎসর্গ

*   *   *

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

—গীতাঞ্জলি

*   *   *

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী
দিন সে কাটায়, গণি গণি বিশ্বলোকের চরণ-ধ্বনি
তারার আলোয় গায় সে সারা রাতি।
কত যুগের রথের রেখা বক্ষে তাহার আঁকে লেখা
কত কালের ক্লান্ত আশা
ঘুমায় তাহার ধূলায়, আঁচল পাতি॥

—গীতাঞ্জলি

*　　　　*　　　　*

তোমার ছুটি নীল আকাশে, তোমার ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি থই-হারা ওই, দীঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুল তলায়, গোলাবাড়ির কোণে
তোমার ছুটি ঝোপে ঝাড়ে, পারুল ডাঙার বনে
তোমার ছুটির আশা কাঁপে কাঁচা ধানের ক্ষেতে
তোমার ছুটির খুসী নাচে নদীর তরঙ্গেতে।

—শিশু ভোলানাথ

*　　　　*　　　　*

মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোন দিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে,
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎ পাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।

—বলাকা

*　　　　*　　　　*

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি, যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।

ব্যথার প্রলাপে মোর্ গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল কোলাহল আনি
মোর গান হানি।

—পূরবী

*　　*　　*

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান ভরা ধন
বৎসরের শেষে
শুধু এক বার মর্ত্যে মূর্তি ধর ভুবন মোহন
নব বরবেশে
তারি লাগি তপস্বিনী কি তপস্যা করে অনুক্ষণ
আপনারে তপ্ত করে ধৌত করে ছাড়ে আভরণ
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে।

—বনবাণী

*　　*　　*

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব,
পাড়ি দিতে নদী, হাল ভাঙ্গে যদি ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব, তুমি আছ আমি আছি।

—মহুয়া

*　　*　　*

কার যেন এই মনের বেদন চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়
ঝুমকো লতার চিকন পাতা কাঁপেরে কার চমকে চাওয়ায়।
হারিয়ে যাওয়া কার সে বাণী কার সোহাগের স্মরণখানি
আমের বোলের গন্ধে মিশে, কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়!

—গীতবিতান

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি
নিত্য কালের আলো আমি
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দ ধারা আমি
অকিঞ্চন আমি
আমার কোন কিছুই নেই অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।

—শেষ সপ্তক

*　　　　*　　　　*

নক্ষত্র বেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মি জাল
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ
দেখি তারে যে পুরুষ, তোমার আমার মাঝে এক ॥

—প্রান্তিক

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা সুদীর্ঘকাল নানাভাবে যে বিরাট আত্মোপলব্ধির বৈচিত্র্যসম্ভারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহারই স্বল্প নিদর্শন এই উদ্ধৃতিগুলি। রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি এই নিখিল বিশ্বের নিত্য নবীনরূপে যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা উপনিষদের ঋষিবর্ণিত সত্যের মতই নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্, তাহা অনোরণীয়ান মহতো মহীয়ান। এই অবর্ণনীয়কেই তিনি সারাজীবন বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এই শব্দাতীতকে শব্দের মালায় গাঁথিয়া বঙ্গবাণীকে উপহার দিয়াছেন, অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার আকুলতাই তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মীর অলঙ্কার-শিঞ্জনে, প্রসাধন-কলায়, ছন্দে, গন্ধে, রূপে, রসে প্রকাশিত। ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাহা কেহ কখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই—রবীন্দ্রনাথও পারেন নাই—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ওই একটি জিনিসই কখনও এঁটো হয়নি"

—কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মোপলব্ধির অপূর্ব উজ্জ্বল প্রকাশ কেবল তাঁহার কাব্যকেই উদ্ভাসিত করে নাই তাঁহার চরিত্রে, তাঁহার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকেও মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। এই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রভাব সাধকের চরিত্রে যে সকল দিব্যগুণাবলীর সমাবেশ করে ব্যক্তিগত জীবনে তাহার প্রকাশ অহঙ্কার-মুক্ত সুভদ্র সৌম্যতায়, কিন্তু সেই সুভদ্র সৌম্যতাই রুদ্র প্রতিবাদে রূপান্তরিত হয় যখনই কোনও সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বর্বরতা মনুষ্যত্বের মহিমাকে আঘাত করে, যখনই মানবের আত্মা অপমানিত হয়, আধ্যাত্মিকতার অসম্মানে যখন সমগ্র মানবিক সভ্যতা কলঙ্কিত হয়। যে সব ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ সংসারত্যাগী, বৈরাগ্যের সাধনাতেই যাঁহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত, তাঁহারা সংসারের অবিচার অত্যাচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু যে ব্রহ্মদর্শী কবি ঘোষণা করিয়াছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ—

তিনি সংসারের, সমাজের, অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সে মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোন অমানব বা অতি-মানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেন না, আমার বুদ্ধি মানব-বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব-হৃদয়, আমার কল্পনা মানব-কল্পনা। মানব নাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই যে দেখা একে ছোট বলব না।

এও সত্য। জীবন দেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।"

এই মুক্তির সন্ধান করিতে গিয়া প্রত্যহের কুশাঙ্কুরে তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, পশুত্বের সংঘাতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বিচলিত হইয়াছে এবং তীব্র প্রতিবাদে বারংবার তিনি বাঙ্‌ময় হইয়া উঠিয়াছেন। মানবসমাজে যে সব ছদ্মবেশী দানব বর্তমান, তাহাদের আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহার বৃহৎ আত্মসম্মান নানা সুরে বহুবার ছন্দিত হইয়াছে। জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়াও তিনি লিখিয়াছেন—

মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন।

লিখিয়া গিয়াছেন—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হ'তেছে ঘরে ঘরে।

আহত আত্মসম্মানের বাণী, পশুত্বের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের উদাত্ত উদ্‌ঘোষণা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু হায়, ললিতবাণীর মোহে মুগ্ধ হইয়া নাচগানের হুজুগে মাতিয়া আমরা আমাদের এই দুর্দিনেও রবীন্দ্রনাথের পৌরুষের দিকটা একেবারে ভুলিয়াছি। মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় যে বোধ হয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত আমাদের অনেকেরই সম্যক পরিচয় নাই, পল্লবগ্রাহিতার সংক্ষিপ্ত সহজ পথে রবীন্দ্রনাথের স্বল্প পরিচয়

পাইয়াই আমরা সন্তুষ্ট আছি এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অংশভাক্ হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। তাহা না হইলে আজ আমাদের এ দুর্দশা কেন? স্বাধীনতার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে বাণীমন্ত্র একদা বঙ্গবাণীর মন্দিরকে মন্ত্রিত করিয়াছিল সে বাণী আজ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে না কেন? নিজেদের দুঃখ দুর্দশা লজ্জার কাহিনী সাড়ম্বরে সংবাদপত্রে ছাপাইয়া নির্বীর্য নপুংসকদের মত অহোরাত্র থিয়েটারী ভঙ্গিতে আজও আমরা কেবলমাত্র হায় হায় করি কেন? আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিনি না, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আমরা পাঠ করি নাই। যদিও বা করিয়া থাকি তাহা আমাদের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে নাই, মনকে স্পর্শ করে নাই, আমাদের পশুত্বের ঘন অন্ধকারে রবীন্দ্র-প্রতিভার জ্যোতির্ময় আবেদনও ব্যর্থ হইয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আত্মসম্মানের যে চিত্র দেখিতে পাই তাহার মূল কথা আত্মশক্তির উদ্বোধন, কোনও বাহিরের শক্তিতে নয়, আত্মার শক্তিতেই বিশ্বাস স্থাপন।

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়,
দুঃখ-তাপে-ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায়, বহু প্রবন্ধে বহুবার বলিয়াছেন। তাঁহার আত্মসম্মান তাঁহাকে আত্মমুখী করিয়াছে, তিনি কাহারও কাছে কখনও ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করেন নাই। ভিক্ষা করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। একটি উদাহরণ দিতে পারি। তিনি যখন স্বকীয় আদর্শের অনুরূপ শান্তিনিকেতন স্থাপন করেন তখন

তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু অর্থের জন্য কাহারও নিকট তিনি ভিক্ষা করেন নাই। শুধু একবার নহে একাধিক বার শান্তিনিকেতনের আর্থিক সঙ্কট তাঁহাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়াছে, যখন তাঁহার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী তখনও তিনি এ দুশ্চিন্তামুক্ত হন নাই এবং তখন ভারতবর্ষের ধনী অথবা রাজন্যবর্গের দ্বারস্থ হইলে তাঁহার শান্তিনিকেতন হয়তো অর্থাভাবমুক্ত হইতে পারিত—মালবীয়জীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রাজন্যবর্গের বদান্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আত্ম-সম্মান তাঁহাকে এ পথে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে যাহা দিয়াছে তাহা অবশ্য তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কাহারও বদান্যতার উপর ভিক্ষার দাবি চাপাইতে চাহেন নাই। তিনি শান্তিনিকেতনকে চালাইতে চাহিয়াছিলেন স্বোপার্জিত অর্থদ্বারা। নিজের পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ তো দিয়াছিলেনই, কিন্তু তাহাতেও যখন কুলাইতেছিল না তখন বৃদ্ধ বয়সে নাচ-গান-অভিনয় করিয়া ভারতবর্ষের শহরে শহরে ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তবু কাহারও নিকট ভিক্ষা করেন নাই। শেষে মহাত্মা গান্ধী আসিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন এবং শান্তিনিকেতনের তাৎকালিক অর্থাভাব মিটাইয়া দেন।

তাঁহার জীবনে ও সাহিত্যে আত্মসম্মানের এরূপ বহু নিদর্শন বর্তমান। যাঁহারা জীবনে ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাই আত্মাকে সম্মান করিতে পারেন। তাঁহাদের চিত্ত বিরাট উপলব্ধির মহান আনন্দে সদাপ্রদীপ্ত, তাই তাঁহারা নির্ভীক, কোন কারণেই তাঁহারা আত্ম-অপমান বা আত্ম-অবনতির পঙ্কে অবলিপ্ত হইতে চাহেন না। যখনই মনুষ্যত্ব. মহত্ত্ব, সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ লাঞ্ছিত ব্যাহত হয় তখনই তাঁহারা সমস্ত ভয় ভাবনা তুচ্ছ করিয়া সমস্ত ক্ষয় ক্ষতির উর্ধ্বে উঠিয়া রাজরোষ বা রাজদণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া অকুতোভয়ে বলিয়া উঠেন—

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র-দূতে বল কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন-শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি? শাস্তি তার তরে
যে পারেনা শাস্তি ভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর
কপট বেষ্টন, যে নপুংস কোনদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়, আপনার
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভা-মাঝে, দুর্গতির করে অহংকার,
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃ-রক্ত প্রায়
সেই ভীরু নত-শির চির শাস্তিভারে
রাজ-কারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে।

অরবিন্দ-নমস্কারে রবীন্দ্রনাথ নিজের আত্মার ঐশ্বর্যকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহার দেশাত্মবোধ এবং আত্ম-সম্মান একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। দেশ যখন ইংরেজের অধীনে ছিল তখন দেশের দুর্দশা মোচনের জন্য রাজ-সরকারে আবেদন-নিবেদন করা তিনি আত্মসম্মান-হানিকর মনে করিতেন।

১৩১১ সালে "সফলতার সদুপায়" প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন, "ইংরেজ যদি বলে, সাধারণ মনুষ্য-স্বভাবের যে নিম্নতম কোঠায় আমি

আছি সেই কোঠায় তুমিও এস, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই, স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ কর, স্বজাতির উন্নতির জন্য তুমি প্রাণ দিতে না পার, অন্ততঃ আরাম বল, অর্থ বল, কিছু একটা দাও। তোমাদের দেশের জন্য আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না!" এ কথা বলিলে তাহার কী উত্তর আছে? বস্তুত আমরা কে কী দিতেছি, কে কী করিতেছি! আর কিছু না করিয়া যদি দেশের খবর লইতাম, তাহাও বুঝি—আলস্য-পূর্বক তাহাও লই না। দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জমা করি; ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই। ঘরের পাশে কী আছে জানিতে হইলেও 'হাণ্টার' বই গতি নাই। তারপর দেশের কৃষি সম্বন্ধে বল, বাণিজ্য সম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল নিজের চেষ্টা দ্বারা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎসুক্যহীনতা সত্ত্বেও আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্য পালন সম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্তব্যনীতির উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হই না। সে উপদেশ কোনও দিনই কোনও কাজে লাগিতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে তাহার দায়িত্ব আছে—যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার দায়িত্ব নাই—এই উভয় পক্ষের মধ্যে কখনই যথার্থ আদান প্রদান চলিতে পারে না। এক পক্ষে অনেক টাকা আছে অন্য পক্ষে শুধু মাত্র চেক বইখানি আছে; এমন স্থলে সে ফাঁকা চেক ভাঙ্গানো চলে না। ভিক্ষার স্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবীস্বরূপে বরাবর চলে না, ইহাতে পেটের জ্বালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, এক একবার মনে হয় আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল, কিন্তু সে অপমান, সে ব্যর্থতা তারস্বরেই হউক আর নিঃশব্দেই হউক গলাধঃকরণ-পূর্বক সম্পূর্ণ পরিপাক করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। আমরা বিরাট সভাও করি, খবরের কাগজেও

লিখি, আবার যাহা হজম করা বড় কঠিন তাহা নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিন তাহার জন্য বৈদ্য ডাকিতে হয় না"।

এ প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল ১৩১১ সালে, আজ ১৩৬৮ সাল। এই প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মধ্যে কি কোনও পরির্বতন আসিয়াছে? পরিবর্তনের মধ্যে তখন আমাদের প্রভু ছিলেন বিদেশীরা, এখন হইয়াছেন স্বদেশীরা। কিন্তু এখনও আমাদের দুর্দশা যেমন ক্রমবর্ধমান, আমাদের জড়ত্বও তেমনি। যে বঙ্গব্যবচ্ছেদ লইয়া রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধ, বহু কবিতা, বহু গান লিখিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার সাহিত্য-কীর্তির একটা প্রধান অঙ্গ, সে বঙ্গব্যবচ্ছেদ তাঁহার মৃত্যুর পর হইয়া গিয়াছে এবং আমরা তাহা সহ্য করিয়াছি। মাঝে মাঝে আজকাল আমরা কোলাহল করিয়া থাকি রিফিউজিদের প্রাপ্য ভিক্ষার আকাঁড়া চাউল ঠিকমত বন্টিত হইতেছে না বলিয়া, মাঝে মাঝে আমাদের খবরের কাগজে সরকারের হুমকি ছাপা হয় অমুক তারিখের মধ্যে এই গৃহহারা ভিখারীর দল বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরের অনিশ্চয়তার মধ্যে যদি ঝাঁপাইয়া না পড়িতে চায় তাহা হইলে তাহাদিগের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে সন্তপ্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সার' উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন—ইহা লইয়া আমাদের গর্বের অন্ত নাই; যেখানে-সেখানে ইহা লইয়া আমরা আস্ফালন করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা কি আমাদের মনে সত্যই কোন দাগ কাটিয়াছে? সত্যই কি আমরা আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি? কই, আসাম হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হইয়া কোনও উপাধিধারীকে তো উপাধি ত্যাগ করিতে দেখিলাম না। সে কালেও যেমন যো-হুজুরের দল আশা করিত যে ইংরেজ সভ্য জাতি, তাহারা আমাদের সম্বন্ধে সাম্যনীতির প্রয়োগ

করিবে, একালের যো-হুজুরের দলও ঠিক তাহাই মনে করিতেছেন। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভুলিয়া গিয়াছেন কিংবা ভুলিয়া থাকিবার ভান করিতেছেন—"সাম্য নীতি সেইখানেই খাটে যেখানে সাম্য আছে। যেখানে আমারও শক্তি আছে তোমার শক্তি সেখানে সাম্যনীতি অবলম্বন করে। য়ুরোপীয়ের প্রতি য়ুরোপীয়ের মনোহর সাম্যনীতি দেখিতে পাই; তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠা অক্ষমের লুব্ধতা মাত্র। অশক্তের প্রতি শক্ত যদি সাম্যনীতি অবলম্বন করে তবে সেই প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে কোনো মতে শ্রেয়স্কর হইতে পারে? সে প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে সম্মানকর? অতএব, সাম্যের দরবার করিবার পূর্বে সাম্যের চেষ্টা করাই মনুষ্যমাত্রের কর্তব্য। তাহার অন্যথা করা কাপুরুষতা।"

পূর্বে বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মানের ভিত্তি তাঁহার আত্মশক্তিতে এবং তাঁহার আত্মশক্তির মূল তাঁহার ব্রহ্মবোধে। বহুকাল পূর্বে ১৩০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "নববর্ষ" প্রবন্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীন সত্তার যে বিশিষ্টতা অনুভব করিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতের যে রূপ তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। তিনি ফললোলুপ কর্মের তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষা-কালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্মের বাসনা, জনসঙ্ঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে, ভয়হীন, শোকহীন, মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাহাকে 'ফ্রীডম' বলে সে মুক্তি

ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু তাহা স্পর্ধিত তাহা নিষ্ঠুর। তাহা পরের প্রতি অন্ধ; তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলি অন্যকে আঘাত করে, এই জন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রি দিন বর্মে চর্মে অস্ত্রেশস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্র মাত্র। এই দানবীয় 'ফ্রীডম্' কোনও কালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিলনা, কারণ আমাদের জনসাধারণ অন্য সকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীন ছিল। এখনও আধুনিক কালের ধিক্কার সত্ত্বেও এই ফ্রীডম্ আমাদের সর্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। না-ই হইল। এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর যে মহত্ত্ব, যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আবাহন করিয়া আনি, অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।...আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ যে নবকিশলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসব-বস্ত্র পরিয়াছেন এ বস্ত্রখানি আজিকার নহে—যে ঋষি কবিরা ত্রিষ্টুভ ছন্দে তরুণী ঊষার বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মসৃণ চিক্কণ পীত-হরিৎ বস্ত্রখানিতে বন-শ্রীকে অকস্মাৎ সাজতে দেখিয়াছেন—উজ্জয়িনীর পুরোদ্যানে কালিদাসের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এই সমীর-কম্পিত কুসুমগন্ধী অঞ্চল প্রান্তটি নব সূর্যকরে ঝলমল করিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবন-সমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পায়..."

রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান স্বাধীন ভারতবর্ষকে তাহার সনাতন শুভ্র সত্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিল। বাহিরের

কোনও জড়বাদী সভ্যতার নকলে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইবে এ কল্পনা তাঁহার আত্মসম্মানকে আঘাত করিত। সর্বপ্রকার অন্ধ অনুকরণ এবং ভণ্ডামির ছদ্মবেশকে তীব্র ব্যঙ্গে বারংবার তিনি ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন। দুই-একটা উদাহরণ দিই—

কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ
ছদ্মবেশে বাড়ে নাকি চতুর্গুণ লাজ
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান।
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?
বলিছে না "ওরে দীন যত্নে মোরে ধর
তোমার চর্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর?"

* * *

ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে?
বলিতেছে যে মস্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কৃপায়!
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কি অহঙ্কার
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার।

সাহেবিয়ানার নকলকেই তিনি যে কেবল ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা নয়, অন্তঃসারশূন্য ভণ্ড আর্যামিকেও করিয়াছেন।

"এটা আমাদের স্মরণ নেই যে যোগাসনে যা পরম সম্মানার্হ, সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা। প্রাণ না থাকলে দেহ যেমন অপবিত্র, ভাব না থাকলে বাহ্যানুষ্ঠানও তদ্রূপ।...তোমার আমার মত লোক যারা তপস্যাও করিনে, হবিষ্যও খাইনে, জুতো মোজা পরে ট্রামে চড়ে পান চিবতে চিবতে নিয়মিত অফিসে স্কুলে যাই, যাদের আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করে দেখে কিছুতেই প্রতীতি হয় না এরা দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, গৌতম, জরৎকারু, বৈশম্পায়ন কিংবা ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, ছাত্রবৃন্দ, যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে এ পর্যন্ত কারো ভ্রম হয়নি

একদিন তিন সন্ধ্যা করে একটা হরিতকী মুখে দিলে যাদের তারপর একাদিক্রমে কিছুকাল অফিস কিংবা কলেজ কামাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে এরকম ব্রহ্মচর্যের বাহ্যাড়ম্বর করা, পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্যোগ-পরায়ণ মান্য জাতীয়ের প্রতি খর্ব নাসিকা সিটকার করা, কেবলমাত্র যে অদ্ভুত, অসঙ্গত, হাস্যকর তা নয় কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।…অতএব হয় সত্যই তপস্যা কর, নয় তপস্যার আড়ম্বর ছাড়।"

ভারত-সভ্যতার যে রূপ তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র তাহার আধ্যাত্মিক রূপই নয় তাহা কর্মে প্রচেষ্টায় প্রতিভায় প্রেরণায় সমৃদ্ধ প্রাণবন্ত রূপ।

"নূতন ও পুরাতন" প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন—"আমরা যখন একটা জাতির মত জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ, বাণিজ্য, শিল্প দেশবিদেশে গতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদান-প্রদান, দিগ্বিজয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল। আজ বহু বৎসর এবং বহু প্রভেদের ব্যবধান থেকে কালের সীমান্ত দেশে আমরা সেই ভারত-সভ্যতাকে পৃথিবী হতে অতি দূরবর্তী একটি তপঃপূত হোম ধূম রচিত অলৌকিক সমাধিরাজ্যের মত দেখতে পাই এবং আমাদের এই বর্তমান কর্মহীন নিদ্রালস নিস্তব্ধ পল্লীটির সঙ্গে তার কতকটা ঐক্য অনুভব করে থাকি, কিন্তু সেটা কখনই প্রকৃত নয়। …আমরা যে কল্পনা করি আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক সভ্যতা ছিল, আমাদের উপবাসক্ষীণ পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকে একলা একলা বসে আপন আপন জীবাত্মাটি হাতে নিয়ে কেবলি শান দিতেন, তাকে একেবারে কর্মাতীত, অতিসূক্ষ্ম জ্যোতির রেখাটুকু করে তোলবার চেষ্টা করতেন, সেটা নিতান্ত কল্পনা।

আমাদের সেই সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন হল পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্তমান সমাজ তারি প্রেতযোনি মাত্র।…"

সমাজ হইতে এই প্রেতযোনিকে দূর করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান তাঁহাকে দিয়া অনেক প্রবন্ধ, অনেক কবিতা লিখাইয়াছে। এ প্রেতযোনি শুধু অতীতের নয়, বর্তমানেরও। শুধু সামাজিক নয়, রাজনৈতিকও। তাঁহার "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম", "সভ্যতার সংকট" যদিও ইংরেজের শাসনকালে লিখিত হইয়াছিল কিন্তু উহাদের বক্তব্য চিরন্তন সত্যের বাণী। যখনই একদল অত্যাচারী শাসনকর্তা ক্ষমতা-মদ-দৃপ্ত হইয়া অসহায় জনসাধারণের উপর যথেচ্ছাচারের স্টীমরোলার চালাইতে যাইবে তখনই উক্ত প্রবন্ধ দুইটির বজ্রবাণী সচকিত করিয়া তুলিবে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়কেই।

"কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" হইতে সামান্য একটু উদ্ধৃত করি—"প্রেষ্টিজ! ওটা যে আমাদের অনেক দিনের চেনা লোক। ওই তো কর্তা, ওই তো আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ওই তো বেহুলা কাব্যের মনসা, ন্যায় ধর্ম সকলের উপরে ওকেই তো পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে। অতএব—

যা দেবী রাজ্যশাসনে প্রেষ্টিজরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

সমাজের কল্যাণের ক্ষেত্রে স্টেটের হস্তক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ কাম্য মনে করিতেন না। আমাদের জল-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সরকারের দ্বারস্থ হওয়াটা তিনি আত্মসম্মান-হানিকর বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালীর চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠেনা। কাজেই জলদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকার বাহাদুরের

দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখা-প্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কী ?"

সন্মানের জন্যও তিনি সমাজের দিকেই চাহিতে বলিয়া গিয়াছেন, রাজদরবারের দিকে নয়। উক্ত প্রবন্ধেরই একস্থানে তিনি বলিতেছেন, "পূর্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায় রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার অন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না, সমাজের প্রসাদ রাজ-প্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তি লাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লী তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত, দেশের-সামান্য লোকে বলিবে মহাশয় ব্যক্তি ইহা সরকারদত্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই।"

রবীন্দ্রনাথের এই অমিত আত্মসম্মানের নিদর্শন তাঁহার সাহিত্যকৃতির বহুস্থানে লিপিবদ্ধ। তাঁহার 'কথা ও কাহিনী', 'সমাজ', 'স্বদেশ', 'আত্মশক্তি', 'নৈবেদ্য', 'শান্তিনিকেতন', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, 'রাশিয়ার চিঠি', 'গোরা' প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার অজস্র পরিচয় বর্তমান। এইসব গ্রন্থ ছাড়াও বহু পত্রে, বহু গল্পে, বহু নিবন্ধে ও কবিতায় তাঁহার বহু আলাপ-আলোচনায় প্রদীপ্ত আত্মসম্মানের দ্যুতি তাঁহার চারিত্রিক মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার আত্মসম্মানের আর একটা বৃহৎ পরিচয় আমরা

পাই তাঁহার শিক্ষা- সংস্কারের প্রয়াসে। মাতৃভাষায় শিক্ষ দিবার সপক্ষে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। স্কুল-কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ আইন-শৃঙ্খলে নিজেদের আবদ্ধ না করিয়াও দেশের ছেলেমেয়েরা যাহাতে ঘরে পড়িয়া নিজের মাতৃভাষায় উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও তিনি শ্রীনিকেতনে করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষার একটি অর্থই সুস্পষ্ট ছিল মনুষ্যত্বলাভ, ডিগ্রী অর্জন করিয়া চাকুরী লাভ নয়। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশের ছেলেমেয়েরা যাহাতে নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে তাহারও অনেক আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন শ্রীনিকেতনে। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার এই আত্মসম্মানবোধ দেশের লোকের নিকট কিন্তু তেমন প্রশ্রয় পায় নাই। দেশের সম্বন্ধে দেশের উন্নতিকল্পে যখনই তিনি সত্য-ভাষণ করিয়াছেন, দেশের জড়তাকে বা মেকী অতি আধুনিকতাকে যখনই তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন তখনই দেশের লোক তাঁহার উপর যে খড়্গহস্ত হইয়াছেন ইহার অজস্র প্রমাণ পুরাতন পত্রিকার ফাইল ঘাঁটিলেই পাওয়া যাইবে। এ সবের উত্তরও তিনি মাঝে মাঝে দিয়াছেন, কিন্তু সে উত্তরের মধ্যেও তাঁহার শালীনতা তাঁহার আত্মসম্মানের দীপ্তি ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার "নিন্দুকের প্রতি" নিবেদন নামক কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র এই—

> হউক ধন্য তোমার যশ, লেখনী ধন্য হোক
> তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে জাগাক সপ্ত লোক
> যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই
> কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ, বিদ্রূপ কেন ভাই।

এই প্রবল আত্মসম্মানের জন্য তাঁহার প্রতি নিক্ষিপ্ত নিন্দা বা কটূক্তি বা এ সম্বন্ধে দেশবাসীর ঔদাসীন্যকে তিনিও যেন তেমন একটা আমল দেন নাই।

আমেরিকার কাষ্টম্‌স্‌ হাউসের কর্মচারীদের অভদ্রতায় বিরক্ত হইয়া তিনি যে আমেরিকা হইতে ফিরিয়াই আসিয়াছিলেন এ সংবাদ অনেকদিন দেশবাসীর গোচর হয় নাই। শ্রীযুক্ত অমল হোম প্রণীত 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' পুস্তক হইতে প্রথম জানিতে পারিলাম যে তিনি যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতায় ক্ষুব্ধ হইয়া 'সার' উপাধি ত্যাগ করেন তখন তাহা অমৃতসর কংগ্রেসে উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, যদিও সে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মতিলাল নেহরু এবং প্রধান পাণ্ডাদের মধ্যে ছিলেন এমন অনেকে যাঁহারা আজ রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমল হোম লিখিয়াছেন—"শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে পাঞ্জাব-ব্যাপারে বড়লাটের কাছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি নিয়ে কোন প্রস্তাবই পেশ বা পাস হল না। অমৃতসরে বেঙ্গল ডেলিগেটদের ক্যাম্পে এ নিয়ে কোন চাঞ্চল্য দেখি নি।··· রবীন্দ্রনাথের এই উপাধি বর্জন ব্যাপারটা সেদিনের কংগ্রেস মহলে কি এ দিনে গান্ধিজীর আসন্ন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কোন দিন বিশেষ কোন সাড়া জাগায় নি।" রবীন্দ্রনাথের উপাধি বর্জনের কথাটাই অনেকে জানেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর পাইয়া তাঁহার আহত আত্মসম্মান যে কি পর্যন্ত মূহ্যমান হইয়াছিল তাহার খবরও উক্ত গ্রন্থে আছে। তখন শান্তিনিকেতনে নিদারুণ গ্রীষ্ম। ভাইস্‌রয়কে চিঠি লিখিবার আট দিন পূর্বে তিনি লেডি রাণু মুখার্জীকে একটি পত্রে লিখিতেছেন—"আকাশের এই প্রতাপ আমি এক রকম সইতে পারি, কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবেই আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।" মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আছে—"শুনে যে কি প্রবল কষ্ট অসহ্য কষ্ট হয়েছিল তা আজও মনে করতে পারি। কেবল মনে হ'তে লাগল—এর কোন উপায় নেই? কোন প্রতিকার নেই?

কোন উত্তর দিতে পারব না? এও যদি নীরবে সইতে হয় তা হলে জীবন ধারণ যে অসহ্য হয়ে উঠবে।" ইহার পর তিনি কলিকাতায় গেলেন বিখ্যাত এক দেশনেতার কাছে প্রটেস্ট মিটিংয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য। তিনি রাজী হন নাই। আরও কয়েক জনের কাছে গিয়াছিলেন, কেহই রাজী হইলেন না—ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের ভয়ে। তিনি অবশেষে মহাত্মা গান্ধিজীকে জানাইলেন যে তাঁহার সহিত তিনি পাঞ্জাবে যাইতে প্রস্তুত আছেন। গান্ধিজীও ইহাতে সম্মত হন নাই।

তখন তাঁহার নিজের হাতে যতটুকু করিবার ছিল, তাহাই করিলেন। একখানি অমর পত্র লিখিয়া বর্জন করিলেন ছার 'সার' উপাধিটাকে।

ইহার পর কবি বিলাত যান। সেখানেও তিনি এক সংবর্ধনা সভায় ঐ বিষয়ে ভাইকাউন্ট সেসিল, অধ্যাপক গিলবার্ট মারে এবং অন্যান্য মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ফলে কিছুই হয় নাই। পার্লামেন্টের ডিবেটে হাউস অব লর্ডস্ জেনারেল ডায়ারকে সমর্থনই করেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজ সাহেবকে লিখিলেন—"The unashamed condonation of brutality expressed in their speeches and echoed in their newspapers is ugly in its frightfulness....The late events have conclusively proved that our salvation lies in our hands···the one path of fulfilment is the difficult path of suffering and self-sacrifice."

যেখানেই দেশের এবং মনুষ্যত্বের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে সেইখানেই কবি প্রতিবাদ করিয়াছেন। জাপান যখন চীনের উপর অত্যাচার করিতেছিল তখনও তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আফ্রিকায় যখন অসহায় কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের বীরত্ব মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছিল তখনও তিনি নীরব থাকেন

নাই। যে রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বালগঙ্গাধর তিলকের অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথই বার্ধক্যে কারারুদ্ধ জওহরলালের হইয়া জবাব দিয়াছিলেন মিস্ র‍্যাথবোন্‌কে।

রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান তাঁহার নিজের বিবেকের প্রতিই সম্মান। কোন কারণেই তিনি কখনও নিজের বিবেকের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেন নাই। ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকতাও অনেকদিন করিয়াছিলেন কিন্তু যখনই সমাজের সহিত তাঁহার ব্যক্তিসত্তার সংঘাত বাধিল তিনি সম্পাদকের আসন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেশাত্মবোধের, তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষণার জ্যোতির্ময় দীপ্তি তাঁহার জীবনে ও সাহিত্যে দেদীপ্যমান, তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গান রচনা করিয়া কংগ্রেসমণ্ডপে গাহিয়াছিলেন, তিনি বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত নিজের দেওয়া সুরে গাহিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস সভাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সহিত বা দেশের রাজনীতির সহিত সম্পর্ক রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ রাজনীতির হীন চক্রান্ত ও দলাদলির নোংরামি তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। বিদেশীর অনুকরণে কংগ্রেস অধিবেশনও তিনি পছন্দ করিতেন না। দেশের জনসাধারণের সহিত মিলিবার জন্য আমাদের দেশের মেলাগুলিকেই তিনি সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু নিয়মিত খদ্দর পরিতেন না, চরকাও কাটেন নাই। গান্ধীজি যে আদর্শ শান্তিনিকেতনে প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাও তিনি পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আত্মসম্মানবোধে ঝুটা বা মেকী কিছু ছিল না, তাহা ছিল তাঁহার বিবেকের অকুণ্ঠিত প্রকাশ। তিনি চিরকাল নবীনের পূজারী। তিনি বারবার দেশের যৌবনকে ডাক দিয়া বলিয়াছেন—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

কিন্তু অতিআধুনিকদের উন্নাসিকতা বা ন্যাকামি তিনি সহ্য করেন নাই। তীব্র ব্যঙ্গে তাহাকে বারংবার ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মসম্মানের আর একটা দিকের কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। তিনি নিজেকে কখনও বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। তাঁহার উদার চেতনা সমস্ত ভারতকে তো বটেই, সমস্ত মানবজাতিকে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

তিনি লিখিয়াছেন—

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে
জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে—

তিনি লিখিয়াছেন—

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বলো
"জয়তু শিবাজি
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, একসঙ্গে চলো
মহোৎসবে আজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পুরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

তিনি লিখিয়াছেন—

জনগণমন অধিনায়ক জয়হে ভারত ভাগ্য বিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা।

ভারতের সভ্যতাকে, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে, ভারতের সমগ্রতাকে, ভারতের ভাব-বিগ্রহকে তিনি সারাজীবন নানাভাবে বন্দনা করিয়াছেন কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজেকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

ও আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

* * *

বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট বাংলার বন বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

* * *

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে
তব আম্রবনঘেরা সহস্র কুটিরে

দোহনমুখর গোষ্ঠে ছায়া বটমূলে
গঙ্গার পাষাণ ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্য কল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গ জননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।

*　　　*　　　*

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
　　হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
　　ঝলিছে অমল শোভাতে
পারে না বহিতে নদী জল-ধার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
　　তোমার কানন সভাতে
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
　　শরৎ কালের প্রভাতে।

শুধু বাংলার প্রকৃতিকেই নয় বাংলার ছেলেকে, বাংলার মেয়েকে, বাংলার সমাজকে, বাংলার নেতাকে, বাংলার বাউলকে, বাংলার কীর্তনকে, বাঙালী-প্রতিভার বৈচিত্র্যকে তিনি সগৌরবে তাঁহার সাহিত্য-কৃতির মধ্যে স্থান দিয়া গিয়াছেন। এই কথা আজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই 'আমি বাঙালী' এ কথা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিতে শঙ্কিত হন পাছে কেহ তাঁহাদের প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট বলিয়া মনে করেন। এ আশঙ্কা অমূলক নয় এবং এ আশঙ্কার মূল আমাদেরই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিহিত আছে। আমরা সত্যই আজ সকলে মনে মনে প্রাদেশিকতার পঙ্কে নিমজ্জিত, তাই বাহিরে একটা সর্বভারতীয়তার

মুখোশকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাই। আসলে আমরা সকলেই প্রায় ছিন্নমূল ভণ্ডের বেশে সাময়িক আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট। যে ঘুড়ি আকাশে স্বচ্ছন্দে ওড়ে সে লাটাইয়ের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করে না। সে সম্পর্ক স্বীকার করিয়াই সে নিজের আকাশ-ভ্রমণ সার্থক কবিতে পারে। কিন্তু যে ঘুড়ি কাটিয়া গিয়াছে, লাটাইয়ের সহিত যাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন, সে যতই না কেন আকাশ-বিহারের আস্ফালন করুক তাহাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে পড়িতে হয়। আমাদের অনেকেরই অবস্থা অনেকটা এই ছিন্নসূত্র ঘুড়ির মত।

এই প্রবন্ধে আমি বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান লইয়াই আলোচনা করিলাম। সে আত্মসম্মানের উৎস যে তাঁহার বিরাট ব্রহ্মোপলব্ধি তাহাই দেখাইবার জন্য তাঁহার কাব্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি। আমাদের আজ যা অবস্থা তাহাতে তাঁহার কাব্যের মাধুর্য, নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য, সঙ্গীতের ঐশ্বর্য, অথবা গল্প উপন্যাস প্রভৃতির অপূর্ব রসোত্তীর্ণতা লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। সে আলোচনা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আমাদের আছে কি? রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা এবং বিচিত্র কাব্য-সম্ভার সুস্থ, সবল, আত্মসম্মানশীল, রসিক, সভ্য, উন্নত সমাজের অনুধাবন যোগ্য। আমবা রবীন্দ্রনাথের গান নাকী সুরে গাহিয়া এবং রবীন্দ্র-নৃত্যের ব্যর্থ নকল করিয়া যাহা করিতেছি তাহা নিতান্তই হাস্যকর। আমরা যদি কোনদিন সুস্থ সবল প্রাণবন্ত জাতি হইতে পারি তবেই রবীন্দ্র-আলোচনা আমাদের পক্ষে সার্থক হইবে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নয়, রবীন্দ্রনাথের আত্ম-সম্মান এবং রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্ব-মর্যাদাবোধের আদর্শই এখন আমাদের রক্ষা করিতে পারে যদি আমরা সে বিষয়ে সচেতন হই। কিন্তু সচেতন হইব কি?

রবীন্দ্রনাথ যে পরনির্ভরতার গ্লানি হইতে আমাদের উদ্ধার করিবার জন্য প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ, কবিতার পর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, স্বাধীনতা পাইবার পর আমাদের সেই পরনির্ভরতা, সেই প্রভুদের পদলেহন প্রবৃত্তি যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আত্মরক্ষা, আমাদের চরিত্র গঠন, আমাদের সাহিত্যের বা শিল্পের মান নির্ণয় সমস্ত কিছুর জন্যই আমরা আজ দিল্লীর দরবারের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। মনে হইতেছে অদূর ভবিষ্যতে দিল্লীর দরবার আমাদের দাম্পত্য-প্রণয়, পিতামাতার স্নেহ, ভ্রাতৃ-প্রেম এবং বন্ধুত্বের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট বা উপাধি বিতরণ করিবে এবং আমরা তাহা কৃতার্থ হইয়া গ্রহণ করিব। আমরা যেন মানুষ নই, আমরা যেন একদল ভিক্ষুক, একদল স্তাবক, একদল মতলববাজ অভিনেতা। আমাদের আত্ম-সম্মান নাই, মেরুদণ্ডের জোর নাই, সত্য কথা বলিবার সাহস নাই, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার স্পর্ধা নাই। চাতুর্য-পূর্ণ কৌশলাকীর্ণ রাজনীতির দাবা খেলার চালে বারবার মাত হইয়াও আমাদের লজ্জা নাই। আমরা কি রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করিবার যোগ্য ?

কিন্তু না, হতাশ হইলে চলিবে না। আসুন, আজই আমরা সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে আমরা মনুষ্যত্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবই। মনুষ্যত্বই একমাত্র আধার যাহা আমাদের ক্ষুধার অন্ন ধারণ করিবে, মনুষ্যত্বই একমাত্র যষ্টি যাহার উপর ভর করিয়া আমরা বাধার দুর্গম দুরারোহ পর্বত লঙ্ঘন করিব, মনুষ্যত্বই একমাত্র আলোক যাহা আমাদের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করিবে, মনুষ্যত্বই একমাত্র আদর্শ যাহার জন্য মরিয়াও সুখ পাইব, মনুষ্যত্বই একমাত্র সঞ্জীবনী যাহা মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার করিবে, মনুষ্যত্বই একমাত্র সুধা, যাহা মৃত্যুভীতকেও রূপান্তরিত করিবে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরে।

এই সুধা লাভ করিবার জন্য যদি আমাদের সমুদ্রমন্থনও করিতে হয়, তাহাও আমরা করিব। আসুন, আজ আমরা বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথের বিশাল মনুষ্যত্ব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা করি—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস-শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই ক্ষুদ্র খণ্ড করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস-মুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব-কর্ম-চিন্তা আনন্দের নেতা
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান গতি

ভাই মনোজ,

তোমার 'সাহিত্যের খবর'-এর জন্য বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গতি বিষয়ে কিছু লেখবার জন্য অনুরোধ করে আমাকে একটু বিব্রত করেছ। তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করা শক্ত বলেই লিখছি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা বলছি বাংলা সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা কোনও জীবিত বাঙালী সাহিত্যিকের কাছ থেকে পাওয়া শক্ত। এর কারণ সাধারণত একজন বাঙালী লেখকের লেখা আর একজন বাঙালী লেখক পড়ে না। প্রথমত, সময় পায় না, নিজের লেখা-পড়া নিয়েই তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্যদিকে মন দেবার অবসর পায় না সে। দ্বিতীয় কারণ, লেখকরা আজকাল নানা দলে বিভক্ত হয়েছে। এক দলের লেখা অন্য দলের লেখকদের আসরে অপাংক্তেয়। তৃতীয় আর একটা কারণ—অনেক লেখক সাহিত্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে আছেন আজকাল। তাঁরা নিজের নিজের ব্যবসায়ের সুবিধা অনুসারে বইয়ের বা লেখকের বিচার করেন। সুতরাং লেখকদের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে সত্য নির্দেশ পাওয়ার আশা দুরাশা বলেই মনে হয়।

ইংরেজী সাহিত্যে একদল লেখক আছেন যাঁরা কেবল বইয়ের সমালোচনা করেন, তাঁদের সমালোচনা উচ্চ কোটির সাহিত্য-মর্যাদাও লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে এ রকম সমালোচকের আবির্ভাব ঘটেনি এখনও। আমাদের সাহিত্যে সমালোচনা-সাহিত্য এখনও একদেশদর্শী এবং পক্ষপাতদুষ্ট। পাঠকেদের মধ্যে অবশ্য অনেক রসিক বিদ্বান সমঝদার লোক আছেন, তাঁদের আলোচনা

অনেক সময়েই প্রকৃত সমালোচনা হয়, কিন্তু তাঁরা লেখেন না। তাঁদের যদি তোমার আসরে টেনে আনতে পার তাহলে বাংলা সাহিত্যের সম্বন্ধে অনেক সত্য খবর পাবে।

যাই হোক এ বিষয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তা অকপটে বলছি। একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্য-আকাশ অন্ধকার হয়ে যায় নি। এঁদের পরও সৃষ্টিধর্মী কথা-সাহিত্যে গৌরব করবার মতো রচনা-সমারোহ দেখা যাচ্ছে। অতি-আধুনিক গল্প-উপন্যাসের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে একদল লেখক-লেখিকা এদেশের আদর্শের বৈশিষ্ট্যকেই মহিমান্বিত করেছেন তাঁদের লেখায়! আমাদের যে চরিত্র আমাদের প্রেমে আত্মত্যাগে ক্ষমায় বীরত্বে, আমাদের যে সংস্কৃতি আমাদের হাটে-মেলায় নাচে-গানে পটে-পুতুলে মন্দিরে-মসজিদে পূজায়-উৎসবে আজও সজীব হয়ে আছে, যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারে আমাদের জীবন আবর্তিত—এঁদের লেখায় আমরা তারই শিল্পান্বিত রূপ দেখতে পাই। দ্বিতীয় আর একদল লেখক বিদেশ-জাত হতাশাবাদকেই তাঁদের রচনার মুল সুর করেছেন। এঁরা কোন কিছুতেই আস্থাবান নন, কোথাও কিছু ভালো এঁরা দেখতে পান না। এঁদের চোখে সত্য-শিব-সুন্দর ধরা দেননি, এঁরা সর্বত্র অসত্য অশিব এবং অসুন্দরের লীলা দেখছেন। এঁদের মধ্যেও বেশ শক্তিশালী লেখক আছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁদের লেখা শাশ্বত সাহিত্যের পর্যায়ে উঠবে কিনা তা বলবার সময় এখনও আসে নি।

তৃতীয় আর একদল লেখক রচনার মাল-মশলা সংগ্রহ করছেন প্রধানত রাজনীতি থেকে। কমিউনিজম্ বা কংগ্রেস, গান্ধিজি বা বিনোবাজি এঁদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। এঁরা প্রায়ই বেশ বিদ্বান লোক।

আর এক ধরনের লেখা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যা অনেকটা আত্মজীবনীমূলক। ডাক্তার লিখছেন নিজের ডাক্তারি জীবনের

অভিজ্ঞতা, উকিল লিখছেন উকিল-জীবনের। ব্যারিষ্টারের মুহুরী, কারা-রক্ষক জেলার, তান্ত্রিক সাধু, পুলিশের দারোগা—সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা সরস করে লিখেছেন। অনেক কাহিনী বেশ রসোত্তীর্ণও হয়েছে। কিন্তু একটা আশঙ্কা জাগে। এঁদের অভিজ্ঞতার পুঁজি যখন ফুরিয়ে যাবে তখনও কি এঁরা লিখতে পারবেন? আর একটা কথা। অভিজ্ঞতার সরস বর্ণনা সাময়িকভাবে মনোরোচক হয়, কিন্তু তা শাশ্বত সাহিত্যের দরবারে স্থান লাভ করতে পারে যদি তাতে 'সৃষ্টি'র ছাপ থাকে। এ ধরনের অনেক লেখাতে অবশ্য সে ছাপ আছে।

চতুর্থ আর একদল লেখক আছেন যাঁরা অশ্লীলতার কারবারী। এ বিষয়ে Peter Fontaine নামক সমালোচকের 'Secrets of an Author' বই থেকে কিছু উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। তিনি লিখেছেন—

"Do I hear you say that this amounts to advocating the prostitution of your art? Well, may be so. But, as was said by a colleague of mine, the trouble with high-brow literature is that it is often so high-brow that it won't sell. Whereas anything low-brow, especially when lower than the navel, usually sells very well. What to do about it? I don't know. One can't alter human nature.

In any discussion on love stories the question inevitably crops up how far it is permissible to go, with good taste, in dealing the intimacies of sex. This is not an age of reticence······Still, even to-day, there is a limit. Some readers thought that this limit had been reached, if not over-stepped, by

Kathleen Winsor in 'For Ever Amber", a story which is very largely concerned with the sex-life of a girl who, in each succeeding chapter climbs into bed with a different man. Yet the book was an unqualified success......"

এ বিষয়ে উক্ত বিদেশী রসিক লেখকটি 'সেল্' এবং 'আনকোয়ালিফায়েড সাকসেস'—এই কথা দুটির উপরই বেশী জোর দিয়েছেন। বইয়ের বেশী কাটতিই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে একটু অশ্লীলতার মশলা দিলে নিশ্চয়ই সুফল ফলবে। ঝাল আর পেঁয়াজ দিলে অনেক বাজে তরকারিও মুখরোচক হয় তা কে না জানে। উনি যে 'For Ever Amber' বইটির উল্লেখ করেছেন সেটি পড়লে কিন্তু যৌন-জীবনের খুঁটিনাটি তত বিস্মিত করে না যত করে সে যুগের ইংলণ্ডের নিখুঁত চিত্রটি। Amber মেয়েটির প্রেম-নিষ্ঠাও মনে দাগ কাটে। বইটি সত্যই রসোত্তীর্ণ। সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে এইটিই শেষ কথা। আধুনিক যুগের লেখকদের অশ্লীলতা-গন্ধী লেখা দু-চারটে পড়েছি, খুব ভালো লাগেনি।

বাংলা সাহিত্যের আর একটা বড় দিক গড়ে উঠেছে যা উল্লেখযোগ্য। সেটি উপকরণ-সংগ্রহের দিক। অনেক সাধক ও গবেষক ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিধান ও পরিভাষা বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি বিষয়েও ভালো বই লেখা হচ্ছে। আমাদের জীবনী-সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে ক্রমশ। অনেক পুরাতন প্রায়-লুপ্ত বই নতুন করে ছাপা হচ্ছে আবার। এ-সব ছাড়াও ছোট বড় রসোত্তীর্ণ নানা প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ-কাহিনী লেখা হচ্ছে আজকাল। বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদও হচ্ছে খুব; প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস সব রকমই।

সাহিত্যের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ— কবিতা এবং নাটক। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্য এ দুটি বিভাগেই পঙ্গু

হয়ে আছে। যুদ্ধোত্তর বিদেশী কবিদের নকলে এবং রবীন্দ্র প্রভাব এড়িয়ে নূতন-কিছু করবার ঝোঁকে আধুনিক কবিতা নামে যে হেঁয়ালিগুলি রচিত হয়ে ছাপা হয় আজকাল, তা সুস্থমনা কোন রসিক চিত্তকে তৃপ্তি দিতে পারে না। অবশ্য ছু-চারজন তরুণ কবির লেখায় সত্যিকার নূতন সুর বাজছে। তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও, তাঁরাই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভরসা, যে সব নামজাদা অতি-আধুনিক কবিরা আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন তাঁরা নন।

অনেক দিন ভালো বাংলা নাটক রচিত হয়নি। এর কারণ সম্ভবত নাটক লেখবার প্রতিভা যাঁদের আছে তাঁরা বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চ গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান না। বিখ্যাত উপন্যাসগুলিকে নাট্যাকারে রূপান্তরিত করে নাট্য-ব্যবসায়ীদের হয়তো ছুপয়সা হচ্ছে কিন্তু নাট্যমোদীদের তৃপ্তি হচ্চে না। নাট্য সাহিত্যের সম্পদও বাড়ছে না। এসব বই যে রাতের পর রাত চলছে এর কারণ আমাদের দেশে একদল থিয়েটার-দেখিয়ে দর্শক অনেকদিন থেকেই আছে। তারা থিয়েটার দেখবেই, এটা তাদের নেশার মতো কম। ভালো মন্দ যে কোনও বই-ই তারা দেখবে।

শ্রদ্ধেয় নট শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাতুড়ী মশাই গত দীপালী সংখ্যা গল্প-ভারতীতে লিখেছেন যে 'আমাদের দেশে ব্যয়সাধ্য থিয়েটারের শরণাপন্ন না হয়ে যদি আমরা আমাদের স্বদেশী যাত্রাকে ভদ্রভাবে সঞ্জীবিত করতে পারি তাহলে আমাদের নাট্যসম্পদও বাড়বে, জাতীয় নাট্য-প্রতিভাও বিকশিত হবার সুযোগ পাবে।'

কথাটা ভেবে দেখবার মতো।

বাংলার অতীত ও ভবিষ্যৎ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। কানপুর বঙ্গসাহিত্য সমাজের উদ্যোগে যে গ্রন্থাগারের আজ হীরকজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে সে গ্রন্থাগার শতায়ু হোক, সহস্রায়ু হোক, তাহা জ্ঞানী-গুণী-সাহিত্যিকদিগের নিকট অনাবিল আনন্দের ও জ্ঞানের আকররূপে উত্তরোত্তর আদৃত হোক, ইহাই কামনা করি। সাহিত্যরসিকগণের নিকট উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার তীর্থ স্বরূপ। আপনাদের গ্রন্থাগারও আশা করি এই আদর্শের অনুরূপ।

এই গ্রন্থাগার যিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম। স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনের পূর্ণ পরিচয় আমি জানি না। যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এই :—তিনি নিরহঙ্কার ও কর্ম্মী মানুষ ছিলেন। গ্রন্থাগার স্থাপন ছাড়া কানপুরে একটি মেয়েদের কলেজ স্থাপন করিয়া তিনি এই প্রদেশের লোকের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বাঙালী অবাঙালী সকলেই তাহাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি কানপুরের Medical Association ও SPCA এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেরও প্রতিষ্ঠাতা। ছেলেদের জন্য একটি স্কুলও তিনি স্থাপন করেন। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও তিনি অন্যতম।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনিও প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বাঙালী যেখানেই

বঙ্গ সাহিত্য-সমাজের হীরক জয়ন্তী উৎসব—কানপুর

গিয়াছে সেইখানেই সে তাহার সংস্কৃতির কিছু চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছে।

ঐতিহাসিকেরা জানেন বঙ্গদেশের সীমারেখা বারম্বার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কিন্তু সে রেখা বঙ্গদেশবাসীকে কখনও সীমাবদ্ধ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী বিজয় সিংহ লঙ্কা-বিজয়ী ছিলেন, অজন্তা চিত্রে বিজয়ের রাজ্যাভিষেক আজও অঙ্কিত হইয়া আছে। বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি তিনি সে দেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সিংহল-কলম্বো নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরম্ লিখিত একটি প্রবন্ধ স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বৃহৎবঙ্গ' পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরম্ লিখিতেছেন—

"The Singalese who form the vast majority of the Ceylonese are descendants of Vijay the Bengali Prince, and hence, in language specially, the Singalese has close affinity with the Bengali. Fifty percent of words of classical Singalese are identical with those of Bengali."

সংস্কৃতির বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া, বাংলার পণ্যদ্রব্য ও শিল্প-সম্ভার বহন করিয়া বাঙালীরা যুগে যুগে দেশ দেশান্তরে গমন করিয়াছেন। গুপ্ত ও পাল রাজত্বে বাঙালী চাঁদসদাগর, ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন, যাভা, বালী, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বাঙালীদের অভিযানের চিহ্ন ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর আজও বর্ত্তমান। কবি সত্যেন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ে—

> বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষার ভয়ঙ্কর
> জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
> কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষপাতন করি'
> বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে, বরভূধরের ভিত্তি
শ্যাম-কম্বোজে ওঙ্কারধাম মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বীট্‌পাল আর ধীমান যাদের নাম অবিনশ্বর!
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্র বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান
বিফল নহে এ বাঙালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।

পাঠান যুগে প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যের প্রেমবন্যা সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল।

রাজনৈতিক ইতিহাসের আবর্ত্তে বাংলার সীমারেখা বারম্বার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে সত্য, কিন্তু বাঙালী প্রতিভা সে সীমারেখাকে বারম্বার উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বকীয় শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য কীর্ত্তি প্রচার করিতে বিরত হয় নাই। বাঙালী কোন দিন ঘরের কোণে বসিয়া থাকে নাই। কাম্বেল সাহেব বাঙালীর এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বলিয়া গিয়াছিলেন যে, এসিয়াখণ্ডের মধ্যে বাঙালীরা এথিনীয় জাতির তুল্য, বিশেষ করিয়া ঔপনিবেশিকতায়।

ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া আজ কিন্তু সেই বাঙালী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। যে সমস্যার আজ সে সম্মুখীন তাহা জীবন-মরণ সমস্যা। সমাধান করিতে না পারিলে বাঙালী জাতি লুপ্ত হইয়া যাইবে।

বাংলার অতিদূর অতীতের চিত্র যে কত উজ্জ্বল তাহা সকলেই জানেন। অনতিদূর অতীতের চিত্রও কম উজ্জ্বল নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রতিভার যে মিছিল দেখা গিয়াছিল

তাহার তুলনা শুধু ভারতের ইতিহাসেই নহে পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। কিন্তু আজ সেই প্রতিভার সমারোহ কোথায়? তুবড়ীর মতো ঊর্দ্ধমুখী অগ্ন্যুৎসবে অন্ধকার আকাশ কিছুক্ষণের জন্য উদ্ভাসিত করিয়া তাহা কি চিরদিনের মতো নির্ব্বাপিত হইয়া গেল? অতবড় হর্ম্ম্য তাসের প্রাসাদের মতো ভাঙিয়া পড়িল? নিশ্চয়ই ইহার একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। এই প্রবন্ধে সেই কারণই নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইব। আমাদের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দ্দশা একদিনে সহসা হয় নাই। ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে সহজেই বোঝা যায় যে বহু রোগের বীজ বহু পূর্ব্বেই উপ্ত হইয়াছিল, আজ যাহা দেখিতেছি তাহা সেই সকলেরই অনিবার্য্য ফলমাত্র এখন আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি—আজকালকার ছেলে-মেয়েরা অপদার্থ, তাহারা লেখাপড়া করে না, উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহাদের নৈতিক চরিত্র নাই, সামাজিক শিষ্টাচার নাই, বিদেশী পোশাক পরিহিত সঙের মতো তাহারা সমাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সবই সত্য, কিন্তু আমার প্রশ্ন, আমগাছে মাকাল ফল ফলিল কিরূপে? সমাজে মাকাল গাছের নিশ্চয়ই আধিক্য হইয়াছে, তাই বাজারে মাকাল ফলের এত ছড়াছড়ি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ভালো ছেলেমেয়ে সমাজে এখনও অনেক আছে যাহারা এখনও আমাদের ভাগ্যের মোড় ফিরাইয়া দিতে পারে, সে বিশ্বাস না থাকিলে এ প্রবন্ধ লিখিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ভারতের সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য যে জাতি এই কিছুদিন পূর্ব্বে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল তাহারা যে একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে এ কথা বিশ্বাস করি না। তাহারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু তাহাদেরই উপর আমার আশা। তাহাদেরই আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে কি লিখিয়া গিয়াছেন—

"বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময় উত্তর ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পাল বংশীয় দেবপাল দেব ভারতবর্ষের সম্রাট

বলিয়া কীর্ত্তিত। লক্ষণ সেনের জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্তত ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙালীরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয় মূলে, যমুনাতটে, সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে এবং বালীদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখনও ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।"

বাঙালী যে ক্ষুদ্র জাতি নহে তাহার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, তাহা স্তূপীকৃত করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই, যে জাতি এই কিছুদিন আগে ভারতে নবজাগরণের মাঙ্গলিক গাহিয়াছিল, যে জাতির মধ্যে এই কিছুদিন আগে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে জাতির মধ্যে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, যতীন দাস, যতীন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো শহীদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যে জাতির পথ-প্রদর্শক মাত্র কিছুদিন আগে দেশবন্ধু এবং নেতাজী ছিলেন সে জাতির আজ এ অধঃপতন কেন? সে জাতি আজ অন্নহীন কেন, কর্ম্মহীন কেন? চারিত্রিক মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া অতি সামান্য অনুগ্রহের জন্য লালায়িত কেন? এ নৈতিক অধঃপতন কবে শুরু হইয়াছিল? আমি ইতিহাসের গবেষক নাহি, সামান্য ছাত্র মাত্র, আমার স্বল্প অধ্যয়ন হইতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলিতেছি। আমার মনে হয় তন্ত্রের অপব্যবহার যখন হইতে আমাদের দেশে শুরু হইয়াছে তখন হইতেই আমাদের নৈতিক অধঃপতনের আরম্ভ। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন আমাদের দেশে বিনষ্ট হইয়া গেল, যখন তাহা সহজিয়া ধর্ম্ম, বীরাচার, প্রভৃতি বীভৎস অনুষ্ঠানে দেশের সাধারণ জনমনকে অভিভূত করিল, তখন হইতেই আমাদের নৈতিক অধঃপতন আরম্ভ। তখন তন্ত্রের

নামে সারা দেশে প্রচলিত অতি জঘন্য ভোগ-লিপ্সার যে ঘৃণ্য ন্যক্কার-জনক বিবরণ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে তাহা উদ্ধৃত করিতেও লজ্জা বোধ করে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে গুহ্যপূজা আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব, কাহাকেও দেখিতে দিব না, এ পূজার অর্থ কি? অর্থ এই যে, সে সকল দেবমূর্ত্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ঐ সকল মূর্ত্তির নাম উহারা বলিত 'শম্বর'। একে তো অশ্লীল মূর্ত্তি, — তাহাতে ভালো কারিগরের হাতের তৈরি — সুতরাং অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। সেই সকল মূর্ত্তি যখন বুদ্ধত্বের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল তখন আর অধঃপাতের বাকী রহিল কি? একজন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের এই সকল পুঁথি, 'ঘোমটা দেওয়া কামশাস্ত্র'। ....."

ইহার পরই মুসলমান রাজত্ব। মুসলমান রাজত্বে যে আমাদের নৈতিক অবনতি আরও নিম্নমুখী হয় ইহার অজস্র প্রমাণ আছে। বাদশাহ, নবাব, আমীর-ওমরাহগণ সকলেই প্রায় কামুক ছিলেন। তাঁহাদের আমলে বাঙালীর নৈতিক চরিত্র আরও অধঃপাতে গিয়াছিল।

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"এমন সময় মূর্ত্তি ধ্বংসকারী দেখা দিলেন, চিত্রকরের তুলি ও ভাস্করের বাটালি হস্তচ্যুত হইল।.. অত্যাচারীদের প্রলয়ঙ্কর চেষ্টায় ভাস্কর্য্য বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইল। লক্ষ্মণ সেনের পরে ভাস্করের অতুলনীয় বিপণির দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। গত সাত শত বৎসরে একখানিও উৎকৃষ্ট শিলামূর্ত্তি এদেশে গড়া হয় নাই। ভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয়, নদীয়ার প্রসিদ্ধ ভাস্কর নবীন ষোড়শ-শতাব্দীতে পাথরের দেবতা তৈরি করিতেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই লিঙ্গমূর্ত্তি, যাহা অত্যাচারীরা ভাঙিবে না। যে সকল দুই তিন মণ ওজনের স্বর্ণবিগ্রহের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা

দেখিতে পাই, তাহার শতাংশের একাংশও কি আর স্বর্ণকার গড়িতে উৎসাহ পাইত! অত্যাচার অনেক সময় দুইভাবে চলিয়াছে—একদফা কোথায় কাহার বাড়িতে কোন সুন্দরী রমণী আছেন—তাহার সংবাদ দিবার জন্য 'সিন্ধুকী' নামক গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল এবং অপরেরা কোথায় কোন্ দেবতা নির্ম্মিত হইতেছেন বা আছেন তাহারও খবর দেওয়ার জন্য গুপ্তচর সর্ব্বত্র আনা-গোনা করিত—"

এই সব সংবাদ হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় মুসলমানদের সময় বাঙালীর নৈতিক বিনষ্টি কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সব যুগে চরিত্রবান বাঙালী যে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা ব্যতিক্রম।

ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন বৌদ্ধ-বঙ্গদেশকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষা দিবার জন্য শূরবংশীয় কোনও রাজা—সম্ভবত আদিশূর—কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বাংলা দেশে আনাইয়াছিলেন। ইঁহারাই বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক এই কুলীনদের বংশধরেরা মুসলমানদের সময় কুলধর্ম্মের বিবিধ বন্ধনে বাঙ্গালী সমাজকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা মুসলমানদের যথেচ্ছাচারের প্রতিক্রিয়া বলিয়া মনে হয়, এবং সম্ভবত ইহা তাঁহারা সাময়িক সাবধানতার জন্যই অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"কনোজের ব্রাহ্মণেরা যে সকল বন্ধনী দিয়া সমাজকে বাঁধিয়া ফেলিলেন তাহা আপৎকালের জন্য বিধান, তাহা সর্ব্বকালের জন্য নহে। জ্বর হইলে রোগীর ভাত বন্ধ হয়, পায়ে ঘা হইলে পক্ষীরাজ ঘোড়াকেও দৌড়াইতে দেওয়া হয় না…"

কিন্তু হায়, রাজনৈতিক অবস্থা উত্তরোত্তর এমন হইল যে রোগী সুস্থ হইয়াও আর ভাত পাইল না, পক্ষীরাজ ঘোড়া শেষ পর্য্যন্ত পঙ্গু হইয়া গেল।

এই কৌলীন্য প্রথা শেষ পর্য্যন্ত বাঙালীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণশক্তির কণ্ঠরোধ করিয়াছে। ইহার উপর ছিল মগ ও বিদেশী জলদস্যুদের

অত্যাচার, লুণ্ঠন ও নারীহরণ। এই সমস্তই সমবেতভাবে বাংলায় নৈতিক চরিত্রকে ক্রমশ হীন হইতে হীনতর করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নামক গ্রন্থে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজের শোচনীয় দুর্গতির প্রমাণসহ অনেক উদাহরণ দেখাইয়া একস্থানে লিখিয়াছেন, "ঘণ্টার পর ঘণ্টা সামাজিক জীবনের এরকম অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার বর্ণনা দেওয়া যায় এবং তা থেকে বোঝা যায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙালী সমাজের কি শোচনীয় বিকৃতি ও অবনতি ঘটেছিল, জাতিগত ও কুলগত দৃঢ়বন্ধনের জন্য। সামাজিক কুলগ্রন্থে পারিবারিক কলঙ্কের কথা থাকা উচিত নয়। সুতরাং কুলগ্রন্থে তা সত্ত্বেও যে সব কাহিনী ও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সামাজিক জীবনে তা যে আরও ব্যাপকভাবে ঘটেছিল তা অনুমান করা যায়। কুলাচার শেষকালে স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলার কুলীন সমাজে। তার সঙ্গে আর্থিক দুর্গতিও ক্রমে চরম সীমায় পৌঁছেছিল। আর্থিক সংকট যত গভীর হচ্ছিল, সামাজিক দুর্নীতি ও ব্যভিচারও তত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সমাজ জীবনের নিয়মই তাই এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম ইতিহাসে কখনও হয়েছে বলে জানা নেই—"

শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় আমাদের নৈতিক দুর্গতির সঙ্গে যে আর্থিক দুর্গতির কথা বলিয়াছেন তাহা মোগল রাজত্বের সময় ততটা হয় নাই, যতটা হইয়াছিল মোগল রাজত্বের অবসানের পর, ইংরেজ আমোলের প্রথম দিকে।

ঔরংজীবের রাজত্বকালে পর্য্যটক বার্ণিয়ের এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন বাংলা দেশের যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে তখন বাংলাদেশে অন্নাভাব মোটেই ছিল না, আর্থিক অবস্থাও বেশ ভালো ছিল। তখন বাংলাদেশে ধান এত প্রচুর হইত যে নিজেদের অভাব মিটাইয়া বাঙালী বণিকেরা তাহা

নৌকা-যোগে ভারতের নানাস্থানে—বিশেষ করিয়া পাটনায় এবং সমুদ্রপথে ভারতের বিবিধ বন্দরে মুসলিপত্তমে ও করোমণ্ডল উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে রপ্তানী করিতেন। প্রচুর চিনি বাংলাদেশ হইতে গোলকুণ্ডা এবং কর্ণাটে যাইত। বাংলাদেশে নানা মিষ্টান্নের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যও তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। তরিতরকারী দুধ মাখন মাছ মাংস প্রচুর পাওয়া যাইত। কুড়িটা মুরগী এক টাকায় মিলিত। হাঁসও খুব শস্তা ছিল। ইহা ছাড়া তখন তুলা ও রেশমের সমৃদ্ধ ব্যবসার আড়ত ছিল বাংলাদেশে। 'বৃহৎবঙ্গ' পুস্তকে দীনেশবাবু একটা হিসাব দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৮ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বস্ত্র বঙ্গদেশ হইতে বিক্রীত হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার, ১৭৯৩ অব্দে, ১৩,৬২,১৫৪ টাকার। শেষের দিকে অঙ্ক কম হইবার কারণ ইংরেজ রাজত্ব তখন শুরু হইয়াছে। তাঁহারা অনেক কলকব্জা করিয়াও বাঙালী শিল্পীদের সহিত প্রতিযোগিতায় পারেন নাই। শেষে অসাধু উপায়ে, অন্যায় আইন প্রণয়ন করিয়া, শিল্পীদের হাতের আঙুল কাটিয়া দিয়া শেষে তাঁহারা এই ব্যবসাকে বিনষ্ট করিয়া দেন।

মুসলমানদের রাজত্বকালে আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমরা অন্নহীন হই নাই। ইংরেজ অধিকারের প্রথম যুগে পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলারা দেশের অর্থ দুই হাতে লুণ্ঠন করিয়াছে। লর্ড ক্লাইব নিজেই লিখিয়াছেন—

"The sudden, and among many, the unwarrantable acquisition of riches had introduced luxury in every shape and in the most pernicious excess···every inferior seemed to have grasped at wealth that he might be able to assume that spirit of profusion

which was now the only distinction between him and his superior."

এই লুণ্ঠনের ফলে আমরা হৃতসর্ব্বস্ব অন্নহীন হইলাম। ইহার কিছুদিন পরেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার Economic History of British India পুস্তকে ইহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও দিয়াছেন 'আনন্দমঠে'—

"লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়। উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘর বাড়ি বেচিল, জোতজমা বেচিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলেমেয়ে স্ত্রী কে কিনে? সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর ইন্দুর বিড়াল খাইতে লাগিল।..."

এই সময় বাঙালী জাতি দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইল। পূর্ব্বে তাহার সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছিল, এইবার সে অন্নহীন ও অর্থহীন হইল। ইংরেজ তাহাদের উপার্জ্জনের পথও রোধ করিয়া দিল। নিজেদের ব্যবসায়ের স্বার্থে তাহারা এমন সব আইন প্রণয়ন করিতে লাগিল যাহাতে বাঙালীদের জগদ্বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি লোপ পায়। নীলকরদের অত্যাচার বাংলার চাষীদের রক্তও নীল করিয়া দিল। অন্যান্য চাষীদের চাষের উন্নতির জন্যও ইংরেজ সরকার কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের বিখ্যাত পুস্তক 'দেশের কথা'য় লেখা আছে—"কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধনের প্রথম ও প্রধান উপায় জলপূর্ত্তির বিস্তার। কিন্তু এই উপায়ের অবলম্বনে গবর্ণমেণ্টের

বিশেষ ব্যয়কুণ্ঠা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।" বিস্তৃত আলোচনা করিয়া উক্ত পুস্তকে তিনি ইহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

সোনার বাংলা শেষে শ্মশানে পরিণত হইল। তখন প্রাণধারণের একমাত্র উপায় রহিল ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজ সরকারে চাকুরি গ্রহণ। ইংরেজ সরকারে চাকুরি মানে, হয় ইংরেজের রাজ্যবিস্তারে বা রাজ্যশাসনে সহায়তা করা, অথবা বিলাতী মালের দালালী বা মুৎসুদ্দি-গিরি করা।

বাংলা দেশের এই ভয়ঙ্কর যুগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিলেন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, কেহ কেহ বলেন ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা পাটনায় হইয়াছিল। সেখানে আরবী ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া তিনি পরে পারস্য ভাষাও অধ্যয়ন করেন। ইসলামী শিক্ষার উপরই তাঁহার জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু শেষে তাঁহাকে ইংরেজিও শিক্ষা করিতে হইয়াছিল চাকুরির জন্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে যুগে ইংরেজের অধীনে চাকুরি করা ছাড়া ভদ্র বাঙালীর অর্থোপার্জ্জনের অন্য কোন উপায় ছিল না। রামমোহন রায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে চাকুরি গ্রহণ করেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেনযে ইংরেজি শিক্ষা না করিলে আমাদের বাঁচিবার পথ নাই। নবজাগ্রত ইয়োরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণই কেবল উদ্দেশ্য ছিল না—সেটা মুখ্য ব্যাপারও ছিল না—মুখ্য ব্যাপার ছিল কিছু ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজ সরকারে চাকুরি গ্রহণ করিয়া অন্নসংস্থান করা। ইংরেজি ভাষা যাহাতে এদেশে অবশ্য শিক্ষনীয় হয় সে জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় বয়স্ক ব্যক্তিদেরও ইংরেজি শিখিবার আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, ইহার অনেক করুণ ও হাস্যকর কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। তখন ইংরেজি অভিধান হইতে কয়েকটা শব্দ মুখস্থ করিলেই চাকুরি মিলিত। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, বালক রামতনু ডেভিড

হেয়ারের স্কুলে ভরতি হইবার আশায় তাঁহার পাল্‌কীর পিছনে মাসের পর মাস ছুটিয়াছিলেন। শুধু তিনি নয় সে যুগে অনেক ছেলেই ছুটিত। ইহার কারণ ঠিক পাশ্চাত্ত্য-দেশ-প্রসূত জ্ঞান-বিজ্ঞান-আহরণের আগ্রহ নহে। ইহার আসল কারণ তখনকার দিনে ইংরেজি শেখা মানে দারিদ্র্যের কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া। এইরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজরা এদেশে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে, এক নব শূদ্র-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন যাহাদের কাজ হইল ইংরেজ সরকারে চাকুরি করা। আর এক নব বৈশ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টিও তাঁহারা করিয়াছিলেন যাঁহাদের কাজ ছিল বিলাতী মালের দালালী ও কারবার করা। এই উভয় মার্গে চলিয়া বাঙালীর আর্থিক কষ্ট ঘুচিল। ইংরেজ সরকার হিন্দু বাঙালীর উপর প্রসন্ন হইলেন। এই সময়েই বাঙালীরা ইংরেজশাসিত ভারতে সর্ব্বত্র বড় বড় চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর যে বাড়-বাড়ন্ত হইয়াছিল, যাহার গল্প আমরা আজও সগর্ব্বে করি, তাহার মূলে ছিল ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুগ্রহ। আমাদের আর্থিক দুঃখ ঘুচিল বটে, কিন্তু আমাদের নৈতিক উন্নতি হইল না, সামাজিক শালীনতাও বাড়িল না। ইহার প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়, কারণ সাহিত্যই জীবনের ও সমাজের দর্পণ। ১৮৬১ সনে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার-নক্‌শা' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"সহরের ইতর মাতালদের (মাতালের বড় ইতর বিশেষ নাই ; মাতাল হলে কি রাজাবাহাদুর, কি প্যালার বাপ গোবরা প্রায় এক মূর্ত্তিই ধরে থাকেন) ঘরে ধরে রাখবার লোক নেই বলেই আমরা রাস্তায়, খানায়, গারদে ও মদের দোকানে মাতলামি কত্তে দেখতে পাই। সহরে বড় মানুষ মাতালও কম নাই, সুদ্ধ ঘরে ধরে পুরে রাখবার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে এখন মাতলামি করতে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে

অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে পেটের ভিতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙালী বড় মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 'লোক রহস্য'-পুস্তকে 'বাবু' শীর্ষক ব্যঙ্গ নিবন্ধে লিখিতেছেন—

"বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফটিকপাত্র ইহাদিগের গণ্ডূষ। অগ্নি ইহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—'তামাকু' এবং 'চুরুট' নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন ইহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। ইহাদিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবেন।... ইহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি 'মদন আগুন' এবং মনাগুনরূপে পরিণত হইবেন। বারবিলাসিনীদিগের মতো ইহাদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন।...যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। ..যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান তিনিই বাবু। . যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে এবং রাগ কেবল সদগ্রন্থের উপর নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু।"

'চারিত্র পূজা' পুস্তকে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী চরিত্রের যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এই :

"আমরা আরম্ভ করি কিন্তু শেষ করি না, আড়ম্বর করি কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না, ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না, আমরা অহংকার

দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না, আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি⋯"

রসরাজ অমৃতলালের ব্যঙ্গ-রচনায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গান' ও 'আষাঢ়ে' পুস্তকে, রজনীকান্ত সেনের ব্যঙ্গ কবিতায় উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে চিত্র আছে সেগুলি গৌরবজনক নহে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের অনুগ্রহে আমাদের আর্থিক দুঃখ ঘুচিয়াছিল, কিন্তু নৈতিক চরিত্র কিছুমাত্র উন্নত হয় নাই। এ দেশে যে শিক্ষা ইংরেজ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল তাহা অর্থকরী বিদ্যা, তাহা সেই বিদ্যা নহে যাহা বিশুদ্ধ চরিত্র-নির্ম্মাণ করে, যাহা মনুষ্যত্বের উদ্বোধক, যাহা আত্ম-বিকাশের উপযোগী। শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া Addison একস্থানে বলিয়াছেন—"What sculpture is to a block of marble education is to the human soul," এ education আমরা ইংরেজ আমলে পাই নাই। আমাদের তখন পয়সার দরকার ছিল, আমরা পয়সা রোজকার কারবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহাই করিয়াছি। আমি সাধারণ লোকেদের কথা বলিতেছি। ইংরেজরা বণিক ছিলেন, অর্থই যে পরমার্থ একথা তাঁহারা নিজেও মনে করিতেন এবং আমাদেরও মনে করিতে শিখাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। 'বিদ্যা বিক্রয়ং ন করোমি'—এই ছিল অধ্যাপকের আদর্শ। কিন্তু ইংরেজ আসার পর হইতে এ উচ্চাদর্শ রাখা আর সম্ভবপর হইল না। ইংরেজ এদেশের শিক্ষক দিগকেও বিদ্যা বিক্রেতায় পরিণত করিল। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"মধ্যযুগের মানুষের কুল কৌলীন্য ও স্থাবর সম্পত্তির বদলে নবযুগের মানুষের দুটি প্রধান অবলম্বন হল Money or intellect—

বিত্ত ও বিদ্যা। বিদ্যাসাগরের বিদ্যা ছিল কিন্তু বিত্ত ছিল না। বিদ্যা যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সহায় হল এবং নবযুগের সমাজে যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জোরে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়াও সম্ভব হল (যা মধ্যযুগে ছিল না) তখন বিদ্যার বাণিজ্যিক বিনিময়েও সে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হননি। বিদ্যার বাণিজ্যিক বিনিময় বলতে তাঁর চাকরির কথা বলছি না, ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসার কথা বলছি। তখন ব্যবসায় বুদ্ধি প্রায় প্রত্যেক কীর্ত্তিমান পুরুষের মধ্যেই প্রবল ছিল। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র সকলেই ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে বাণিজ্য বুদ্ধি ও বিদ্যাবুদ্ধির এক বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল।"

ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই. কিন্তু সেই সমন্বয়ের ক্রমবিকাশ যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা ভয়ঙ্কর। গুরু-শিষ্যের সঙ্গে আজ ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্ক, শিক্ষক এখন ছাত্রের হস্তে লাঞ্ছিত হন, ঘুস লইয়া বা মারের ভয়ে তাহাকে পরীক্ষায় পাশ করাইয়া দেন, ছাত্রদের হুমকিতে মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত, কারণ তাহাদের হাতেই ভোট।

অর্থকরী বিদ্যার প্রবর্ত্তন সত্ত্বেও কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে নবজাগরণ আসিয়াছিল। তাহার প্রথম কারণ নবজাগরণের নেতারা পূর্ব্বপ্রচলিত স্বদেশী সনাতন শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের মেরুদণ্ড ঋজু, চরিত্র বলিষ্ঠ এবং কল্পনা বহুমুখী ছিল। দ্বিতীয় কারণ, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য্যের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছিল। তৃতীয় কারণ, যে রেনেশাঁসের জাগরণমন্ত্রে ইয়োরোপের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল সেই রেনেশাঁসের উজ্জীবনী সুর আমরাও শুনিতে পাইয়াছিলাম। তাহার রেশ আজও আমাদের কানে লাগিয়া আছে।

এই রেনেশাঁসের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ। সমস্ত বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া প্রতিটি ব্যক্তি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে

সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। দ্বিতীয়, ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে পারিবারিক বন্ধন এবং সামাজিক কুসংস্কার-শৃঙ্খল ছেদন করিতে হইবে। তৃতীয়, দেশের অতীত ইতিহাসের মধ্যে জীবনের আদর্শ সন্ধান করিয়া নব যুগের আলোকে সেগুলির মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে।

ইহাতে যে সুফল ফলিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এই আন্দোলনের সময় বাঙালীদের বর্ত্তমান দুর্গতির বীজও উপ্ত হইয়াছিল। রেনেশাঁসের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্বকে অমান্য করিবার মনোভাব রামমোহন- বিদ্যাসাগরের মতো লোকের ব্যক্তিত্বকে সুপরিস্ফুট করিলেও সাধারণ লোকেয় পক্ষে ইহা হিতকারী হয় নাই। আমাদের সমাজ-জীবনে ইহা নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। আমাদের নৈতিক অধঃ-পতন পূর্ব্বেই হইয়াছিল, এই রেনেশাঁসের ধুয়ায় আমাদের ছেলেরা আরও উৎসন্ন যাইতে লাগিল। হিন্দু বাঙালী ছাত্রেরা পার্কে বসিয়া মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ করিতেছে, ধর্ম্মত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইতেছে, সংযমহীন যৌন ব্যাপারে জঘন্যভাবে লিপ্ত হইতেছে, ইহা তখন দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। আমাদের দুর্নীতির আগুন এই রেনেশাঁসের হাওয়ায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমরা বাহিরে সাহেব হইলাম বটে, কিন্তু ভিতরে পশু হইয়া গেলাম।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা-কল্পে আমাদের নেতাগণ নানারূপ শৃঙ্খল ছেদন করিতেছিলেন। এই শৃঙ্খল ছেদন ব্যাপারটা যতদিন সামাজিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ ছিল ততদিন ইংরেজ সরকার আমাদের সহায়ক ছিলেন। সমাজ সংস্কারের অনুকূলে নানারূপ আইন প্রণয়ন করিয়া আমাদের সহায়তাও করিতেছিলেন, কিন্তু উনবিংশ-শতাব্দীর শেষের দিকে আসল শৃঙ্খলটি যেই আবিষ্কৃত হইল এবং বাঙালী যখন সেই দুশ্ছেদ্য পরাধীনতা-শৃঙ্খল-ছেদনে কৃতসংকল্প

হইলেন তখনই গোল বাধিল। ইংরেজ রাজপুরুষগণ বাঙালীদের প্রতি বিরূপ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী-দলনের আয়োজন শুরু হইল। অর্থাৎ বাঙালী নেতাগণ তাহাই করিতে লাগিলেন, যাহা, শুনিয়াছি কবি কালিদাস নাকি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যে ডালে বসিয়াছিলেন সেই ডালটার মূলেই তিনি নাকি কুড়ুল চালাইতেছিলেন। ইংরেজদের যে অনুগ্রহ-নৌকায় আরোহণ করিয়া বাঙালীরা তাঁহাদের দারিদ্র্য-সাগর পার হইতেছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া তাঁহারা সেই নৌকাটার তলদেশেই বড় বড় কয়েকটা ফুটা করিয়া দিলেন। ফলে, ভরাডুবি হইল। এই প্রসঙ্গে প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি একটি প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা হইতেই খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

"ইংরেজি শিক্ষার আলোকে কতকগুলি হিন্দু বাঙালী আত্ম-আবিষ্কার করেছিলেন সেদিন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে ইংরেজ-রাজত্বের মহিমাছত্রের তলে তাঁদের যে সুবিধাই থাকুক না কেন, তাঁরা আসলে পরাধীন। স্বর্ণ-পিঞ্জরে বন্দী বিহঙ্গের সুখের মতোই তাঁদের সে সুখ অলীক। প্রকৃত সুখের ভিত্তি স্বাধীনতা। একার স্বাধীনতা নয়, সকলের স্বাধীনতা। কেবল হিন্দু বাঙালীর স্বাধীনতা নয়, নিখিল ভারতের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তাঁরা যা করেছিলেন তাই আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস। বলা বাহুল্য, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন মুষ্টিমেয়। এখনও যেমন অধিকাংশ লোক সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করাটাই পরমার্থ মনে করেন, কোনরকম হাঙ্গাম হুজ্জৎ, গোলমাল-আন্দোলন, যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করেন না, তখনও তেমনি ছিল। ছেলেরা বোমার দলে যোগ দিক এ কেউ চাইত না। কিন্তু না চাইলেও ছেলেরা বোমার দলে যোগ দিয়েছিল, বাংলাদেশের উজ্জ্বল রত্নরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই সংগ্রামে, বরণ করেছিল জেল, ফাঁসী, দ্বীপান্তর নির্য্যাতন। স্বাধীনতাকামী হিন্দু বাঙালীর আদর্শ মাতিয়ে

তুলেছিল সেদিন সারা ভারতের নব যৌবনকে। ইংরেজরা দেখলেন তাঁদের শিল তাঁদের নোড়া নিয়ে আমরা তাঁদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙতে উদ্যত হয়েছি। একি সহ্য করা যায়? আইনের পর আইন, অত্যাচারের পর অত্যাচার করে' তাঁরা আমাদের প্রতিরোধ করবার যে চেষ্টা করছিলেন তার কাহিনী আজ সুবিদিত। তারপর থেকেই শোনা যেতে লাগল বঙ্গভঙ্গের কথা, প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা, কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের নোংরামি। তখন থেকেই তাঁরা ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশে প্রদেশে যে সব বৃক্ষের বীজ বপন করে' গেছেন তা যে বিষবৃক্ষ তার প্রমাণ আমরা এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি। হিন্দু বাঙালীর বিরুদ্ধে মুসলমানকে, বিহারীকে, আসামীকে, ওড়িয়াকে বস্তুত ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশবাসীকে সংঘবদ্ধ করার মন্ত্র ইংরেজই সৃষ্টি করেছেন প্রতিশোধ কামনায়। আদর্শবাদী হিন্দু বাঙালীর মেরুদণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করে' দিতে চেয়েছেন তাঁরা, কারণ এই হিন্দু বাঙালীই প্রথমে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কামনায়—"

আমরা স্বাধীনতা নামধেয় একটা কিছু পাইয়াছি বটে। কিন্তু যে বাঙালী তাহার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এই স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে এই স্বাধীন ভারতে তাহার অবস্থা কি? এক কথায় শোচনীয়। তাহার নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সংহতি বহুপূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল। ইংরেজের আমোলে দুই পাতা ইংরেজি পড়িয়া সে বহুদিনের উপবাসের পর দুই মুঠা খাইতে পাইতেছিল, স্বাধীনতার জন্য সেটুকু সে বিসর্জ্জন দিয়াছে। এই স্বাধীনতা তাহার বুকের উপর খড়্গাঘাত করিয়া তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে, কোটি কোটি শিরামুখ হইতে রক্ত ঝরিতেছে, দেশ ভাসিয়া গেল। ঘরে বাহিরে কোথাও তাহার স্থান নাই, সে সংখ্যালঘু বলিয়া শাসন ব্যবস্থায় তাহার বিন্দুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই। সে খাইতে পায় না, চাকুরি পায় না, ব্যবসা করিবার সুযোগ পায় না। তাহার একদা

জগদ্বিখ্যাত গৃহশিল্পকে সঞ্জীবিত করিবার সক্রিয় চেষ্টা কোথাও নাই, যাহা দেখা যায় বা শোনা যায় তাহা স্তোক মাত্র। যে একদিন সারা ভারতের উপদেষ্টা ছিল, আজ সকলে তাহাকেই উপদেশ দেয়, অনুকম্পা করে, তাহার বাসস্থান কাড়িয়া লইয়া বা বিলাইয়া দিয়া তাহাকে অরণ্যে যাইতে বলে। এমন কি তাহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ভাষা ও সাহিত্যও আজ সঙ্কটাপন্ন। আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিতে পারিব বলিয়াই একদা স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলাম, আজ শুনিতেছি মাতৃভাষায় নয়, হিন্দীতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে বাঙালীদেরও আজ বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ নাই, বাংলার বাহিরে তো নাইই, বাংলা দেশেও নাই। ১৫ই ফেব্রুয়ারির 'যুগান্তর' পত্রিকায় শ্রীমণীন্দ্র নাথ মোদক লিখিয়াছেন —"আমি ভারত সরকারের সেনা বিভাগের কর্ম্মচারী। আমার মত কর্ম্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশেরই জীবন অতিবাহিত হয় বাংলার বাহিরে। উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষা-পর্ষদের অধীন বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা দেয়া হয় হিন্দী অথবা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। বাংলা তথায় অবজ্ঞাত ও অবহেলিত। সেজন্য আমাদের সন্তানগণকে বাধ্য হইয়াই হিন্দীভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে হয়। ভাবিয়াছিলাম বাংলার বাহিরে বাংলা ভাষা অবজ্ঞাত হইলেও, বাংলাদেশে বাংলাভাষা নিশ্চয়ই সম্মানিত এবং আমরা যদি কখনও বাংলাদেশে যাইতে পারি তবে আমাদের সন্তানগণ নিশ্চয়ই বাংলা শিক্ষার সুযোগ পাইবে। এই আশায় আশান্বিত হইয়া চেষ্টা করিয়া বারাকপুরে বদলী হইয়া আসি। এখানে আসিয়া দুইটি হিন্দী উচ্চ বিদ্যালয় পাই···এ দুটির একটিতেও বাংলা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই। কর্ম্মোপলক্ষে ভারতবর্ষের বহু প্রদেশই দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র একটি প্রদেশই দেখিলাম, যে প্রদেশের ভাষা এরূপ অনাদৃত। সে আমার এই বাংলা মা।"

ইহার কারণ বাঙালী একদা ইংরেজি শিখিয়া রাজসরকারে যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, অন্নসংস্থানের যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, এখন হিন্দী শিখিয়া সে তাহাই করিতে চায়। কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছে যে এই সার্ব্বভৌম গণতন্ত্রে ভোটেরই আধিপত্য। হিন্দী-ভাষীদের ভোটই সর্ব্বাধিক, মহম্মদ জিন্নাসাহেবের ভাষায়—brute majority, সুতরাং গোটা গোটা হিন্দী অভিধানগুলিকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেও অর্থাগমের ক্ষেত্রে, হে বাঙালী, তুমি কোনও সুযোগ পাইবে না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ইংরেজরা যখন হইতে আমাদের উপর অপ্রসন্ন হইয়াছেন তখন হইতেই নানাবিধ আইন করিয়া তাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও অনেক ক্ষতি করিয়াছেন। ইহার ফল হইয়াছে যে বাঙালী ছেলে-মেয়েরা, বিশেষ করিয়া যাঁহারা বাংলার বাহিরে বাস করেন তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের মর্য্যাদার সহিত পরিচিত নহেন। সেদিন একজন বি, এ, ক্লাসের ছেলের খবর পাইলাম, সে নাকি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং রজনী সেনের নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই। বঙ্কিম রবীন্দ্রের নাম অনেকে জানে বটে কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণ রচনা কেহ পড়ে নাই। আজকাল প্রায়ই অনেক সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক উৎসব হয়, কিন্তু সেগুলিতে যাহা হয় তাহার সহিত সাহিত্য বা সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নাই, তাহা একটা 'পিক্‌নিক্' গোছের ব্যাপার, যাহার উদ্দেশ্য আত্মরতি ও আত্মপ্রচার, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোন বিশেষ সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক দল নিজেদের ধার-করা মত আস্ফালন করেন, যাহা অনেকটা সেকালের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপেরই আধুনিক চলন্ত রূপ।

বঙ্গসাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্ভারের পরিচয় বাঙালী ছেলে-মেয়েরা আর রাখে না। তাহাদের সাহিত্যচর্চ্চা এখন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত লালসা-ক্লিন্ন গল্প পাঠে নিবদ্ধ, তাহাদের নাট্য-শিল্প-প্রীতি তৃতীয়-শ্রেণীর সিনেমাতে পরিতৃপ্ত। বাংলায় একটি

দৈনিক পত্রিকা নাই যাহা পাঠ করিয়া বাঙালী আত্মগৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারে। যে সব পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশের যুবকদের অন্তরে শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিত, তাহারাই আজ 'যো হুকুম' পত্রিকায় পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা বাঙালীদের হিতৈষী এবং যাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই অধঃপতিত জাতিকে প্রেরণা দিয়া এখনও সঞ্জীবিত করিতে পারেন তাঁহারা সরকারের অনুগ্রহলাভের আশায় গা বাঁচাইয়া চলিতেছেন। নাম করিব না, একজন আমাকে বলিয়াছিলেন—"এসব করতে গেলে প্রাদেশিকতা বৃদ্ধি পায়, লোকে বলবে এরা অহঙ্কারী জাতি, আত্মপ্রশংসাতেই পঞ্চমুখ।" ইহার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র বহুকাল পূর্ব্বে দিয়া গিয়াছেন—"অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী ; এখানেও তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি। ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চালয়ের একটি মূল।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলে কি হইবে, আমরা বধির।

আমরা (বাংলার বাহিরে যাঁহারা বাস করি) যাহাতে আরও বধির ও অন্ধ হইয়া পড়ি আমাদের সরকার ক্রমশঃ সে বন্দোবস্ত পাকা করিতেছেন। সম্প্রতি বিহার ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা জানাইয়াছেন যে অতঃপর শিক্ষার ও পরীক্ষার মাধ্যম হইবে হিন্দী। বাংলা ও উর্দুভাষীদের মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষালাভ বন্ধ হইবে। ইহার বিরুদ্ধে নানাস্থান হইতে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু শেষফল কি হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত বিহার বাংলার অন্তর্গত ছিল, এখনও বিহারে এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে বাংলাই মুখ্য ভাষা, বিহারের বাহির হইতে সরকারি কর্ম্মের জন্য বহু বাঙালীকে বিহারে বাস করিতে হয়, বহু উদ্বাস্তুকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিহারে বসবাস করিতে হইয়াছে, ইহাদের সকলকে মাতৃভাষা বর্জ্জন করিয়া হিন্দীকে বরণ করিতে হইবে ইহাই আইন হইতেছে। আমাদের

Constitution-এ ১৪টি ভাষাকে জাতীয় ভাষার (National-language) সম্মান দেওয়া হইয়াছে, কোন বিশেষ ভাষা-ভাষী কোন প্রদেশে অধিক সংখ্যায় থাকিলে সেই ভাষায় তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইবে এ আশ্বাসও Constitution এ আছে। তবু হিন্দীকেই প্রাধান্য দিবার জন্য সকলে ব্যস্ত, হিন্দীকেই একমাত্র জাতীয় ভাষা বলিয়া প্রচার করিতে হিন্দী-ওয়ালাদের কুণ্ঠা নাই। প্রতিবাদ করিতে গেলেই তাঁহারা বলেন—আমরা নীচমনা প্রাদেশিক, আমরা হিন্দীর শত্রু, তাই আমাদের এই আচরণ। আমরা যে হিন্দীর শত্রু নহি, আমরা যে হিন্দী ভাষাকে ঘৃণা করি না, তাহার কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাঙালীর স্থান ও দান অকিঞ্চিৎকর নহে। বাঙালীর হিন্দী-প্রীতি যে কি পরিমাণ, কৃষ্ণনগর কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা লিখিয়া সম্প্রতি ডি, ফিল ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত সংবাদগুলি তাঁহার পুস্তক হইতেই সংগ্রহ করিয়া দিলাম—

(১) বাংলার ব্রজবুলি-সাহিত্যে বাঙালীর হিন্দী-প্রীতির চিহ্ন আছে।

(২) অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র হিন্দীতে কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৩) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে 'বেতাল পচীসী' সম্পাদনা করিয়াছিলেন বাঙালী তারিণীচরণ মিত্র, ১৮০৫ সালে।

(৪) রামমোহন রায় হিন্দী গদ্যের মূল্য স্বীকার করিয়া তাঁহার বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ (বেদান্তসার, বেদান্ত গ্রন্থ ১৮১৫) হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজি তাঁহার হিন্দী ভাষার সুখ্যাতি করিয়াছেন।

(৫) হিন্দী 'বেতাল পচীসী' অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা করেন।

(৬) ভারতবর্ষের ঐক্যবিধানের জন্য হিন্দীভাষার গুরুত্ব কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালী চিন্তানায়কগণ বহুপূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বিহার প্রদেশে ভূদেবচন্দ্রই হিন্দীকে আদালতী ভাষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিহারে তিনি অনেকগুলি স্ট্যাণ্ডার্ড হিন্দী স্কুলেরও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নামে একটি স্বর্ণ-পদক এখনও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয়।

(৭) বারাণসীর বাবু তারামোহন মিত্র হিন্দী ভাষার সমর্থক এবং হিন্দী 'সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে এলাহাবাদের বাবু সারদাপ্রসাদ সান্যালের নামও উল্লেখযোগ্য।

(৮) এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' বাঙালীর। সে প্রেস হইতে হিন্দী 'শব্দসাগর', 'রামচরিত মানস' প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দীর বিখ্যাত পত্রিকা 'সরস্বতী' এই প্রেসেরই কীর্ত্তি। ইহার আদর্শ ছিল রামানন্দবাবুর 'প্রবাসী'।

(৯) খড়ীবোলী হিন্দীর প্রাচীনতম সংবাদপত্র 'জাম-ই-জাহান্-নুমা' বাংলা দেশ হইতে হরিহর দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১০) হিন্দীর প্রথম সংবাদপত্র 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত যুগলকিশোর। হিন্দীর দ্বিতীয় পত্র বাহির হয় রাজা রামমোহনের তত্ত্বাবধানে। নাম 'বঙ্গদূত'।

(১১) কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বাহির করেন হিন্দী 'বঙ্গবাসী'। পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল।

(১২) সর্ব্বপ্রথম হিন্দী মহিলা-পত্রিকাও বাহির করেন বাঙালী। পত্রিকার নাম 'সুগৃহিণী', সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী। ইনি পাঞ্জাবের বিখ্যাত হিন্দী সমর্থক নবীনচন্দ্র রায়ের কন্যা।

(১৩) হিন্দী পত্রিকা 'বিশাল ভারত' 'মনোহর কঁহানীয়া' প্রভৃতি মাসিকপত্র আজও হিন্দী সাহিত্যের সেবা করিয়া চলিয়াছে। এগুলি বাঙালীরই সৃষ্টি।

(১৪) ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন জষ্টিস সারদাচরণ মিত্র নাগরী-লিপি প্রসার করিবার জন্য বহুপূর্ব্বে বহু চেষ্টা করিয়াছেন।

ইহা সব অতীতের ইতিহাস, বর্ত্তমান অতি-আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের স্রোতও যে বাঙালী প্রতিভার প্রাণধারায় পুষ্ট হইতেছে ইহা কে না জানে?

না, হিন্দী ভাষার সহিত আমাদের কোনও শত্রুতা নাই। আদান-প্রদান দ্বারা উভয় ভাষা আরও সমৃদ্ধ হোক, ইহা সাহিত্যিক মাত্রেরই কাম্য। হিন্দী ভাষার সহিত আমাদের শত্রুতা নাই, কিন্তু হিন্দী-জবরদস্তির সহিত আছে। আমরা British Imperialism সহ্য করি নাই, Hindi Imperialismও করিব না। ইহারই জন্য প্রয়োজন হইলে এই ভাগ্যহত জাতিকে আবার হয়তো সংগ্রাম করিতে হইবে।

আমাদের দুর্দ্দশা এবং দুঃখ যে কি, তাহার মূল যে কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত তাহা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার প্রতিকার কি? সকল প্রকার সফল প্রচেষ্টার প্রথম ও প্রধান মূলধন নৈতিক চরিত্র। সর্ব্বাগ্রে নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য আমাদের যত্নবান হইতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজে এচরিত্র নির্ম্মিত হইবে না, সেখানে চারিত্রিক অবনতির ব্যবস্থা আছে, উন্নতির ব্যবস্থা নাই। যে সব বালক-বালিকারা সুকুমারমতি অল্প বয়স্ক তাহাদের পিতামাতাদের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে

তাহাদের চরিত্র সুগঠিত হয়। পিতামাতারাই আদি শিক্ষক, তাঁহাদের আদর্শ এবং প্রেরণাই সন্তানের চরিত্র গঠন করে। রাজপুত রমণীগণ সন্তানদের চরিত্রে যে ভাবে আদর্শের মহিমা মুদ্রিত করিয়া দিতেন, এই কিছুদিন আগে বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী তাঁহার সন্তানকে যে ভাবে মানুষ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান যুগের জননীদের তাহাই করিতে হইবে। তাঁহারা এই মহাব্রত যদি নিষ্ঠাভরে পালন করিতে পারেন তবেই এই হতভাগ্য জাতির উদ্ধারের আশা আছে।

যে সব ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক, যাহারা পিতামাতার আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে তাহাদের ভার লইতে হইবে সমাজের আদর্শবাদী সচ্চরিত্র শিক্ষকদের। অবসরপ্রাপ্ত আদর্শবাদী শিক্ষক আমাদের সমাজে এখনও অনেক আছেন, তাঁহাদের বিশেষ কোন কাজ নাই, তাঁহারা যদি সঙ্গ দান করিয়া, শিক্ষা দিয়া প্রত্যেকে অন্তত দুইটি যুবককেও সত্যপথে চালিত করিতে পারেন তাহা হইলে আর ভাবনা কি? দেশকে বা জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে খুব বেশী সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র একশত আদর্শবাদী বিশুদ্ধচরিত্র যুবক চাহিয়াছিলেন দেশ উদ্ধারের জন্য। আদর্শের অগ্নি যদি স্বল্প সংখ্যক যুবকের হৃদয়েও তাঁহারা জ্বালাইয়া দিতে পারেন, সমস্ত দেশ আলোকিত হইয়া যাইবে। বিশুদ্ধ-চরিত্র যুবক যুবতীই দেশের দুঃখ দূর করিতে পারে, তাহারা আমাদের মধ্যেই আছে, তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তখন নেতারা বুঝিয়াছিলেন যে যুবক-যুবতী কিশোর-কিশোরীরা যদি শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী না হয় তাহা হইলে কোন আন্দোলনই সফল হইবে না। তাই প্রথমে তাঁহারা 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ৺সতীশ চন্দ্র বসু। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শরীরে ও মনে বাঙালীকে শক্তিশালী

করা। এই সমিতিতে শারীরিক উন্নতির জন্য ডন বৈঠক কুস্তি হইত। লাঠিখেলা শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। ছোরা খেলা, তরবারি শিক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ, জুজুৎসু প্রভৃতিও শেখানো হইত। নৌকা পরিচালনা, অশ্বারোহণ প্রভৃতির আয়োজন ছিল। সামজিক কায়দায় ড্রিল ও 'মক্ ফাইট্' (mock fight) হইত। তরবারিতে মার্ত্তাজা সাহেবের পদ্ধতি, বড় লাঠিতে অতুল ঘোষ, ছোট লাঠি ছোরা তলোয়ারে যাতুবাবু, মুষ্টি যুদ্ধে নগেন দত্ত, সুরদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। জাপানী ওস্তাদ 'গিঝিন' জাপানী তলোয়ার খেলা শিখাইত। পরে পুলিন দাসও আসিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত জীবনতারা হালদারের লিখিত একটি পুস্তিকা হইতে আমি উক্ত সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি লিখিতেছেন—"মানসিক উন্নতির জন্যও নানারূপ আয়োজন ছিল। বিদেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে সকলকেই উৎসাহিত করা হইত। বিশেষ করিয়া বীরপুরুষদের জীবন চরিত, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার কাহিনী, মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, গ্যারিবল্‌ডির জীবন, নিহিলিষ্ট রহস্য প্রভৃতি পাঠ্য ছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশের কথা ও জন্মভূমির প্রকৃত পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা হইত। ইহার জন্য সখারাম গণেশ দেউস্কর বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।...নৈতিক উন্নতির জন্য প্রতি রবিবার রামায়ণ মহাভারত চণ্ডী গীতা পাঠ করিয়া তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইত। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানাবিধ উপদেশ ও সাধনপদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। নিয়মিতভাবে স্বদেশ বন্দনা ও সঙ্গীত হইত। সত্যচরণ শাস্ত্রী, স্বামী সারদানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং আরও অনেক জ্ঞানী চরিত্রবান পুরুষ নিয়মিতভাবে সমিতিতে যোগদান করিয়া সমিতির সভ্যদের উপদেশ দিতেন।

আমাদের আবার এইরূপ অনুশীলন সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে সখারাম গণেশ দেউস্করকে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে, স্বামী সারদানন্দকে, সত্যচরণ শাস্ত্রীকে। ভিন্ন নামে তাঁহারা আমাদের মধ্যে এখনও আছেন। এই কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রশ্ন দেশবাসীকে করিয়াছিলেন সেই প্রশ্ন আবার আমাদের যুবক-যুবতীদের শুনাইতে হইবে, প্রকৃত উত্তরের জন্য তাহাদের প্রস্তুতও করিতে হইবে। স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"হে ভাবী স্বদেশ হিতৈষিগণ, তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। উপায় স্থির করিয়াছ কি? তোমরা কি পর্ব্বত-প্রমাণ বাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে? দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে—ধর্ম্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও, ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ।"

স্বামীজির এই উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে হইবে তবেই আমাদের দুর্গতি ঘুচিবে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যায়, বাঙালীরা শিল্পী এবং সেইজন্যই তাহারা বিদ্রোহী। বড় বড় রাজ্যের উত্থান-পতনের মূলে আছে বাঙালী প্রতিভা। এই সেদিনও সে দলে দলে জেলে গিয়াছে, ফাঁসী গিয়াছে, নির্ব্বাসন নির্য্যাতন বরণ করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে আবার তাহাকে বিদ্রোহ করিতে হইবে। এখন আমরা স্বাধীন, কিন্তু এই স্বাধীন রাষ্ট্রেও যে সব অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, পক্ষপাত, চৌর্য্যবৃত্তির নমুনা দেখিতে পাইতেছি, তাহা যদি সীমা ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে বিদ্রোহই অনিবার্য্য পরিণাম। বাঙালী সংখ্যা-লঘু বলিয়া দেশের শাসন-ব্যবস্থায় তাহার কোন হাত নাই।

কিন্তু সংখ্যাধিক্যই সব সময় জয়লাভ করে না, গুণাধিক্য থাকিলে একটি কৃতী পুরুষই অসংখ্য সামান্য ব্যক্তিকে নিষ্প্রভ করিয়া দেদীপ্যমান হইতে পারেন। অসংখ্য নক্ষত্র যে অন্ধকার দূর করিতে পারে না, একটি চন্দ্রই তাহা পারে। সারা দেশ জুড়িয়া আজ যে অনাচার, অবিচার, অত্যাচারের তাণ্ডব চলিয়াছে বাঙালী যুবক-যুবতীরা তাহাদের প্রতিরোধ-কল্পে যদি প্রাণদান করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন তাহা হইলে রাজনীতিক্ষেত্রেও উজ্জ্বল মহিমায় আবার তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

আমি আশাবাদী, যাহারা বর্ত্তমান যুগের উপর বীতরাগ, যাহারা ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশাহীন, আমি তাঁহাদের দলে নহি।

বাংলা সাহিত্য

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। বঙ্গভারতীর সামান্য সেবক আমি, সুদূর প্রবাসে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে আমাকে আহ্বান করিয়া আপনারা যে সৌজন্য ও আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বহুদিন পূর্বে, ব্রিটিশ আমলে, ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালীরা আমাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, নানা কারণে তখন আসা সম্ভবপর হয় নাই। আজ আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারিয়াছি বলিয়া সত্যই আমি আনন্দিত।

কিছুদিন পূর্বেই বঙ্গ-সাহিত্যসংসার হইতে কয়েকজন কৃতী সাধকের তিরোধান ঘটিয়াছে। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কবি জীবনানন্দ দাশ এবং ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নাই। সর্বাগ্রে ইঁহাদের উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে কবি এবং সাহিত্যিকের আবির্ভাব কবে ঘটিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই। যখনই ঘটিয়া থাকুক, তাঁহারাই যে মানবসভ্যতার সম্ভাবনা সূচিত করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে ইতিহাসের নির্দেশ আজ সুস্পষ্ট। কবি-ভাবাপন্ন মানব-শিল্পীদের কিছু কিছু ইতিহাস গুহাগাত্রে চিত্ররূপে আজও উৎকীর্ণ আছে। প্রস্তরযুগের সেই সব গুহাচিত্রগুলি হইতে আমরা তাহাদের জীবনযাত্রার, তাহাদের জীবনদর্শনের কিছু কিছু আভাস আজও পাই। প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহারা বন্য পশু শিকার করিত কেবল এই খবরটুকুই আমরা পাই না। তাহাদের

মৃতদেহ সৎকারের প্রথা হইতে জানিতে পারি যে, মৃত্যুকে তাহারা জীবনের অবসান বলিয়া স্বীকার করে নাই, তাহারা মৃত্যুকে দীর্ঘ রহস্যাবৃত নবজীবনের আরম্ভমাত্র মনে করিত। তাই তাহারা ভূ-প্রোথিত শবের সহিত খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার দিত, তাহাকে বিবিধ বর্ণসম্ভারে সজ্জিত করিত। সেই সুদূর অতীতের বর্ণবৈচিত্র্য, সুদূর অতীতের সেই শিল্পীদের কীর্তি গুহাগাত্রে আজও অম্লান হইয়া আছে। মনে হয় পরবর্তী যুগের আর্যঋষিরা যে আশ্বাসভরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ', কবি গ্যয়েটে যে বিশ্বাসভরে বলিয়াছিলেন—'Life is but the childhood of Immortality—(আমাদের ইহজীবন অনন্তজীবনের শৈশবমাত্র)' —সুদূর অতীতের সেই আদিম মানবদের মনেও হয়তো সেই একই আশ্বাস-বিশ্বাস অঙ্কুরিত হইয়াছিল। গুহাগাত্রে খোদিত এই সব চিত্রই পরবর্তী যুগে চিত্রাক্ষর সৃষ্টি করিয়াছে। প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ এই চিত্রাক্ষরের সাহায্যেই আমরা মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাস আজ জানিতে পারিয়াছি। মিশর, উর, ব্যাবিলন, চীন এবং আরও অনেক দেশের ইতিহাস এই চিত্রাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। মহেঞ্জোদাড়ো, হড়প্পায় যে সব চিত্রাক্ষর পাওয়া গিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই, হইলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসেব অনেক লুপ্ত তথ্য আমরা জানিতে পারিব।

মানবজাতির ইতিহাসে কতবার কত দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছে, হিমানীপ্রবাহে, বন্যায়, ঝঞ্ঝাবাতে, দাবানলে প্রাচীন মানবসমাজ বারম্বার বিড়ম্বিত হইয়াছে, পরস্পারের সহিত যুদ্ধ করিয়া কত রাজ্য কত জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু তাহাদের সহিত আমাদের যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় নাই, তাহার কারণ তাহাদের শিল্পীরা একদা পর্বতগাত্রে ছবি আঁকিয়াছিল, যে ছবি কালক্রমে বিবিধ বর্ণমালায় রূপায়িত হইয়াছে। এই বর্ণমালার মৃত্যু নাই, তাই বোধ হয় আমাদের দেশের জ্ঞানীরা ইহাকে 'অক্ষর'

অর্থাৎ ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অক্ষরেই মানব-সভ্যতার ইতিহাস বিধৃত হইয়া আছে। মুণ্ডক উপনিষদের ঋষি এই অক্ষর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অণু হ'তে অণুতর যিনি দীপ্তিমান
সর্বলোক, লোকবাসী যাঁর মাঝে লীন,
যিনি মৃত্যুহীন,
যিনি বাক্য, যিনি মন-প্রাণ,
তাঁরেই অক্ষর বলি জান বারে বারে
তিনি সত্য, তিনি লক্ষ্য, ওহে সৌম্য ভেদ কর তাঁরে।

এই অক্ষরকে এবং এই অক্ষরের বাণী-মূর্তি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া এইবার আমার বক্তব্য নিবেদন করি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কথা বলিবার আগে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-চারি কথা বলা বাঞ্ছনীয়, কারণ বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকার জন্যই তাহা প্রয়োজন।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোনও সময়ে পুরাতন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। প্রাচীনতম বাংলার নমুনা আমরা পাই কয়েকটি শিলা ও ধাতু-লেখে, বাঙালী পণ্ডিত সর্বানন্দকৃত অমরকোষের টীকায় এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত বৌদ্ধগান ও দোহায়। ইহার পরই আমরা পাই চণ্ডীদাসকৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের উল্লেখ। এগুলি চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত। শিখদের আদিগ্রন্থের দুইটি পদ অনেকে জয়দেব কর্তৃক প্রাচীন বাংলায় রচিত বলিয়া মনে করেন। অনেকের ইহাও বিশ্বাস যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রথমে প্রাচীন বাংলায় রচিত হইয়াছিল, পরে তাহা সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়। কবি জয়দেব ছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক।

১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা গৌরবের আসন লাভ করিয়াছে এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহা পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছে, ইহাই পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত।

এই নয় শত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কিন্তু বাংলা গদ্যের স্থান নাই।

বাংলা সাহিত্যের শৈশবে, অর্থাৎ সাহিত্য যখন কেবল কবিতাতেই নিবদ্ধ ছিল তখন সে সাহিত্যের বিষয়-বস্তু ছিল প্রধানত দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তন। ঐতিহাসিকের বিচারে বাংলা ভাষার জন্ম দশম শতাব্দীতে হইলেও, উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্যের সন্ধান আমরা পাই পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে তুর্কিরা বাংলাদেশ আক্রমণ করে এবং সেইজন্যই সম্ভবত বাঙালীর সাহিত্যসাধনা বহুকাল ব্যাহত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙালী-প্রতিভা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই শতকে যে সব কবির দেখা আমরা পাই, তাঁহাদের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রভাবিত। এই যুগের কবি রামায়ণকার কৃত্তিবাস ওঝা এবং পদরচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার কবি চণ্ডীদাস। এই যুগের অন্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচয়িতা মালাধর বসু। এই কালেই মিথিলায় মহাকবি বিদ্যাপতির অভ্যুদয়। পরবর্তী কালে কবিশেখর, কবিবল্লভ এবং গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির প্রতিভায় প্রভাবিত হইয়া অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি নামে হোসেন শাহের জনৈক কর্মচারীও অনেক পদ রচনা করিয়া দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আদি মনসামঙ্গল পাঁচালিও এই সময় রচিত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। এই মহাপুরুষের আবির্ভাব তদানীন্তন বঙ্গসমাজের যে রাজনৈতিক ও পারমার্থিক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল তাহার বিবরণ সুধী-সমাজে অবিদিত

নাই। তাঁহার প্রতিভা-দীপ্তি শুধু বঙ্গে নয়, বঙ্গের বাহিরেও দিব্যজ্যোতি বিকিরণ করিয়াছিল, আজও করিতেছে। তাহার বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষেত্রে অবান্তর। বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্কটুকু কেবল সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যদেব' পুস্তকের এক স্থানে বলিয়াছেন—"নব বসন্তের প্রফুল্ল প্রভাতের প্রাক্কালে পিক-পক্ষীর অস্পষ্ট কাকলীর ন্যায় মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর ঝঙ্কারে শ্রীজয়দেব, শ্রীগুণরাজ খান প্রভৃতি অতিমর্ত্য সাহিত্যিকগণ শ্রীগৌরচন্দ্রের আগমনী-গীতি গান করিবার জন্য সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন।" গুণরাজ খান মালাধর বসুর উপাধি। এই সঙ্গে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নামও তিনি করিতে পারিতেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল: কবিরাই মহাপুরুষদের এবং মহাবিপ্লবের ক্ষেত্র সর্বদেশে প্রস্তুত করিয়াছেন, বাংলাদেশেও তাহার অন্যথা হয় নাই। এই শতাব্দীতে আর একটি নূতন ধরনের সাহিত্য-কীর্তির প্রবর্তন বাংলা সাহিত্যে হয়,—সমসাময়িক মনুষ্যের চরিত্র ও মহিমা লইয়া কাব্য-রচনা। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী ও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া অনেক বিখ্যাত পুস্তক সে সময়ে রচিত হইয়াছিল। মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, পরমানন্দ গুপ্ত, গোবিন্দদাস প্রভৃতি এই সময়ের বিখ্যাত লেখক। বৈষ্ণব গীতিকাব্যের বহুলপ্রচার এবং কাব্যে-গানে ব্রজবুলির প্রচলনও এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সময় হইতে বৈষ্ণব কবিতা বাংলা সাহিত্যের কাব্যে প্রাণসঞ্চার করিল। এই শতাব্দীর আর একটি স্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। মাণিক দত্ত, মাধব আচার্য, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ সকলেই চণ্ডীমঙ্গল লিখিয়াছিলেন; মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত, ইনি প্রাচীন বাংলার

শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও অন্যতম। মুকুন্দরাম কবিতায় নিজের আত্মকাহিনীও লিখিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান-মোগলের সংঘর্ষে বাংলাদেশে তখন ঘোর অরাজকতা চলিতেছে। এই অরাজকতার বিশদ মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাই কবিকঙ্কণের আত্মকাহিনীতে। অত্যাচারের ফলে মুকুন্দরামকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছিল, তিনিও একদিন 'রেফিউজি' হইয়াছিলেন—এসবের বিস্তারিত বাস্তবানুগ চিত্র তাঁহার কাব্যে তিনি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্যেই আমরা প্রথম বাস্তবধর্মী অর্থাৎ realistic রচনার আস্বাদ পাই। পরে এ বিষয়ে তাঁহাকে অনেকে নকল করিয়াছেন। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যও ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শাসনকর্তা মুসলমানেরা সে সময় কবিদের উৎসাহ দিতেন। লস্কর পরাগল খানের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর পাণ্ডববিজয় কাব্য লেখেন, পরাগলের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। কোচবিহারের রাজারাও মহাভারতের পর্বগুলিকে পাঁচালি রূপ দেওয়াইয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল রাজত্ব শুরু হইয়াছে। বাঙালী কবিদের কল্পনা কিন্তু এই গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তনে তেমন বিচলিত হয় নাই। তাঁহাদের কল্পনা তখনও বৈষ্ণব গীতিকাব্যের ভাবরসে আবিষ্ট। বৈষ্ণবপদাবলী, বৈষ্ণবজীবনী এবং কৃষ্ণলীলাই তখন বাঙালী কবিদের প্রধান প্রেরণা এবং বাংলা কাব্যের প্রধান অবলম্বন। এই সময় শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি বহু পদকর্তার নাম পাওয়া যায়; আপনাদের ধৈর্যচ্যুতির ভয়ে তাঁহাদের নামের তালিকা আর দিলাম না। এই শতাব্দীর আর একটি কবির নাম কিন্তু না করিলে চলিবে না, তিনি মহাভারতকার কাশীরাম দাস। তাঁহার আসল পদবী দেব, জাতিতে তিনি কায়স্থ ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন তিনি মহাভারতের চারিটি পর্ব—

আদি, সভা, বন ও বিরাট পাঁচালি-রূপে লিখিয়াছিলেন ; পরবর্তী পর্বগুলি পরে অন্য কেহ লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু পরবর্তী গবেষকেরা বলেন, মহাভারতটাই কাশীরাম দাসের রচনা। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ লইয়াও দুই-একখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে উত্তরবঙ্গে সমাদৃত অদ্ভুতাচার্যের কাব্যটি উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুতাচার্যের আসল নাম নিত্যানন্দ।

দেবী মনসা, চণ্ডী এবং শিবঠাকুর তখনও বাঙালী কবিদের কল্পনার খোরাক জোগাইতেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মনসামঙ্গল, দেবীমঙ্গল এবং শিবায়ন কাব্য রচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যই স্বপ্নাদেশে রচিত বলিয়া কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন। কবি ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। মুকুন্দরামের অনুকরণে ইনিও আত্মপরিচয় ও তাৎকালিক অরাজকতার বর্ণনা করিয়াছেন। সে সময়ে রাঢ়দেশীয় কাব্যরচয়িতারা অনেকেই এই বিশেষ রীতির অনুকরণ করিতেন। রাজনৈতিক পরাধীনতার গ্লানি তখন এই মঙ্গলকাব্যগুলির ভিতর দিয়াও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এই সব মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটু নূতন ধরনের স্বাদ মেলে কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্যে। ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায় এই কাব্যের নায়ক। কুম্ভীর-দেবতা কালুরায়ের কাহিনী এবং পীর বড়খাঁ গাজির কাহিনীও ইহাতে আছে। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের পূজা করার রীতি পৃথিবীর আদিম মানবসমাজে সর্বত্র আছে। আমাদের রামায়ণের হনুমান জাম্বুবানও পূজনীয় দেবতা ; কিন্তু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরকে কাব্যে স্থান আর কেহ বোধ হয় দেন নাই। সেই হিসাবে এই মঙ্গলকাব্যটি নূতনত্বের দাবী রাখে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক ভাবধারার প্রধান উৎস বৈষ্ণব গীতি-কাব্য ; বৈষ্ণব ভাবধাবার উচ্ছলিত প্রেম-তরঙ্গে

তখন বাঙালীর চিত্ত অবগাহন করিতেছে। যে বিদেশী মুসলমানগণ শাসকরূপে বাংলায় আসিয়াছিলেন তাঁহারাও কালক্রমে বাঙালী হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই বৈষ্ণবীয় প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই সময় কয়েকজন মুসলমান পদকর্তার নাম পাওয়া যায়—নসীর মামুদ, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মর্তুজা, আলিরাজা এবং আলাওল। আরাকানের রাজসভাতেও এই সময় বাংলা সাহিত্যের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা দৌলত কাজি ও আলাওলের নাম পাই। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় তাঁহার 'কবি দৌলৎ কাজির সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাননী' নামক পুস্তকে বলিতেছেন, "বঙ্গসাহিত্যে এই যে একটানা নিছক ধর্মের সুর এতদিন চলিয়া আসিতেছিল তাহা বদলাইয়া নূতন ধরনে অবিমিশ্র প্রেমকাহিনী লইয়া কাব্য রচনার সম্মান মুসলমান কবিদেরই প্রাপ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মুসলমান কবিরা শুধু যে নিছক ধর্মাত্মক কাব্য-রচনার ধারা পরিবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, ফার্সি ও প্রাচীন হিন্দী-সাহিত্য হইতে অজ্ঞাত অভিনব কাহিনীসমূহ আনিয়া বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সৃষ্টি করিলেন।" অধ্যাপক মহাশয় যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার উক্তির যথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে যাহাদের সহিত আমাদের এত বিরোধ, সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে তাহারা আমাদের কত আপন। এই সেদিনও পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য মুসলমান ছেলেমেয়েরা পুলিসের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যকর্মের ইতিহাস শেষ করিবার পূর্বে ধর্ম-ঠাকুরের ছড়া ও ধর্মপুরাণ-কাহিনীর কথা উল্লেখ করা উচিত। অনেকের মতে ধর্ম-ঠাকুরের নামে বুদ্ধপূজাই বাংলা দেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই আদিদেব ধর্মের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া কিছু মঙ্গলকাব্যও লেখা হইয়াছিল। এগুলি প্রকৃতই কাব্য এবং

এগুলিতে সেকালের রাঢ়ভূমির যে চিত্র অঙ্কিত আছে, লাউসেনের বীরত্বে ও অভিযানগুলিতে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা তখনকার বাঙালী-মনের ও বাঙালী-সংস্কৃতির পরিচায়ক। অধ্যাপক সুকুমার সেন ধর্মমঙ্গলকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা গদ্যের জন্ম। ছন্দোবদ্ধ কবিতার গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া বাংলা সাহিত্য এবার প্রশস্ততর সৃষ্টির ক্ষেত্র আবিষ্কার করিল। কিন্তু সে সৃষ্টির মহিমা বিকশিত হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও পূর্বের মত পদাবলী-সংগ্রহ, রামায়ণ ও মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ কাব্য রচনা, কিছু কিছু মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন এবং সত্যনারায়ণের পাঁচালি প্রভৃতি সাহিত্যকর্মের পূর্বানুবৃত্তি চলিতেছিল, কিন্তু এ যুগের শ্রেষ্ঠ গৌরব—এ যুগে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে সাহিত্যরসিক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একটি প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন, "এ দেশে ইংরেজের শুভাগমনের পূর্বে বাংলা দেশ ব'লে যে একটা দেশ ছিল, আর সে দেশে যে মানুষ ছিল আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল আর সে ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হ'ত এই সত্য স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এই নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। কেন না ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এ সত্য বিস্মৃত হওয়া সহজ, যেহেতু আমাদের শিক্ষাগুরুদের মতে বাঙালী জাতির জন্ম-তারিখ হচ্ছে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ…"

এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা শক্তিসাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকে পাইয়াছি। ইনিও একখানি কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠদান ভক্তিমূলক শ্যামাসঙ্গীতগুলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শৈব সিদ্ধাদিগের কিছু গাথাও বিরচিত হইয়াছিল। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা এবং কানুপা এই চারিজন সিদ্ধার মাহাত্ম্যকীর্তনই সে সব গাথা ও কাহিনীর উদ্দেশ্য।

ইহার পরই ইংরেজের আগমন এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই বাংলা গদ্যের জন্ম। এই সম্পর্কে শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁহার 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, "বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বলিয়া যাহা খ্যাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর নীহারিকা অবস্থা হইতে তাঁহাদের (অর্থাৎ তৎকালীন ইংরেজ পণ্ডিতদের) সম্মিলিত চেষ্টাতেই তাহা প্রথম নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে বাংলা দেশ ও বাঙালীজাতি সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের কাছেই ঋণী। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর দান নাই বলিলেই হয়। যে একজনমাত্র বাঙালীর নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পাই, তিনি ইঁহাদের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত; ইঁহাদের উৎসাহ ও অন্নে প্রতিপালিত; স্বাধীনভাবে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ইহার কোন কীর্তিই নাই। এই একক বাঙালীর নাম রামরাম বসু। .."

খৃষ্টীয় ১৭৪৩ অব্দে পর্তুগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর, কারণ এই বৎসর হুগলী শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে প্রথম বাংলা মুদ্রণ আরম্ভ হয়। বাংলা হরফ প্রথমে স্বহস্তে প্রস্তুত করেন উইলকিন্স সাহেব। পঞ্চানন কর্মকার পরে তাঁহার নিকট ইহা শিক্ষা করে।

উক্ত গ্রন্থে সজনীকান্ত এই প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছেন "১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে যাহার সূত্রপাত, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহার একুশ বৎসরের ইতিহাস খুব বিরাট ও বিচিত্র হইবার কথা নয়, কিন্তু তথাপি সেইগুলিই গোড়ার কথা এবং সত্য ও কৃতজ্ঞতার খাতিরে এই ইতিহাস আমাদের জানিতেই হইবে। সত্য বটে কোন মৌলিক রচনা এইকালে রচিত হয় নাই, সত্য বটে লেখক ও সংগ্রাহক মাত্রেই বৈদেশিক, তথাপি এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায়

নাই যে ইঁহাদের সমবেত চেষ্টাতেই বাংলা লেখিত-গদ্য একটা রূপ ধারণ করিতেছিল—যাহা বাঙালী-লেখকের লেখনীমুখে সর্বপ্রথম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই একুশ বৎসরের ইতিহাসে যে ছয়জন বৈদেশিক কর্মী বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দশিক্ষা প্রণয়ন করিয়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের "দুর্গম দুরারোহ ভূখণ্ডে ব্যাকরণ অভিধানের খন্তা কোদাল চালাইয়া" একটা পথ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—নাথানিয়াল ব্রাসি হালহেড, জোনাথান ডানকান, এন. বি. এডমনস্টোন, হেনরি পিট্‌স্ ফরস্টার, এ. আপজন এবং জন মিলার। সর্বশেষ—উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বজনবিদিত।

ইহাদের নিকট আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ, কিন্তু এ কথাও ইতিহাসে সুবিদিত যে তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্যই এতটা পরিশ্রম করেন নাই, করিয়াছিলেন নিজেদের প্রয়োজনে, বিলাত হইতে আগত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীদের বাংলা শিখাইবার জন্য। বাংলা ভাষায় বাইবেল-ধর্ম প্রচার করিবার তাগিদও বড় কম ছিল না। তবুও এ কথা আমরা কৃতজ্ঞার সহিতই স্বীকার করিব যে, বাংলা গদ্যের সেই প্রথম যুগে ওয়ারেন হেষ্টিংসের মত লোকের দৃষ্টিও ভারতীয় সাহিত্য-সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মীদের চেষ্টায় আইন-গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করে। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মুদ্রিত হইবার পর চণ্ডীচরণ মুনশীর 'তোতা ইতিহাস,' রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম,' এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। শুদ্ধ এবং কথ্য গদ্যের সুষ্ঠু প্রকাশভঙ্গী তাঁহার রচনাতেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই।

কেরী, মার্শম্যান এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় বহু বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সম্ভ্রান্ত যে সব বাঙালী ইহাতে যোগ দিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব এবং রাজা কালীকৃষ্ণ দেব। রামমোহন লিখিয়াছিলেন বেদান্ত দর্শন, শাস্ত্রবিচার বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থ, একটি উৎকৃষ্ট বাংলা ব্যাকরণ এবং ব্রহ্মসঙ্গীত। সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুমের সঙ্কলন করাইয়াছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। ইহা তাঁহার মহতী কীর্তি। এই যুগের অধিকাংশ গদ্যরচনাই সংস্কৃত, ফারসী বা ইংরেজীর অনুবাদ। মৌলিক রচনা তেমন কিছু নাই। বহু স্থান হইতে বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সে যুগের মনীষীরা তখন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করিতেছিলেন। সে সময়ে সাধারণ লোকের রসপিপাসা তৃপ্ত হইত কবিওয়ালাদের গীত ও যাত্রায়, আর্যা তরজা খেউড় কবিগান পাঁচালি ও হাফ-আখড়াইয়ের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক পদ্ধতির পাঁচালি-রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন দাশরথী রায়। তাঁহার রচনায় সেকালের রঙ্গ-রসিকতা, শব্দবিন্যাসের চাতুর্য এবং সেকালের বাঙালী-মানসের একটা পরিচয় আমরা পাই।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় সাময়িক পত্রের আবির্ভাব। 'সমাচার দর্পণ' এবং 'বাঙ্গালা গেজেটি' প্রকাশিত হইল। সাময়িক পত্রের মারফত বাঙালী জনসাধারণ বাংলা গদ্যের রসাস্বাদন করিল। ক্রমশ 'সংবাদ' কৌমুদী 'সমাচার চন্দ্রিকা' এবং 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হইল। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। 'নববাবুবিলাস' তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য কৌতুক-রচনা। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্ত। বাংলার রসসাহিত্যে তাঁহার আসন কোথায় তাহা

আপনারা সকলেই জানেন। এই 'সংবাদ প্রভাকরে'ই কবিতা লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেন।

ইহার পরই বাংলার নবযুগ—ইয়ং-বেঙ্গলদের যুগ। এই যুগের যাঁহারা যুগন্ধর তাঁহাদের প্রধান কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যের সদ্য-নির্মিত ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করা। শুধু তাহাই নহে, বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পাশ্চাত্ত্য আধুনিকতার, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে নব-রূপে মূর্ত করিবার বিবিধ চেষ্টাও ইহারা করিয়াছেন। যে আধ্যাত্মিকতা, সমাজের যে সব প্রাচীন নিয়মাবলী প্রাণহীন হইয়া কুৎসিত তামসিকতায় পরিণত হইয়াছিল, সে সবের বিনাশ সাধন করিয়া সাহিত্যে ও সমাজে সুস্থ, প্রাণবান, যুক্তিযুক্ত পাশ্চাত্ত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ইহারা যত্নবান হইয়াছিলেন। সে যুগে ইহারা ছিলেন বিদ্রোহী, সর্ববিধ সংস্কারের অগ্রদূত। অধ্যাপক ডিরোজিও ছিলেন ইহাদের গুরু। এই ডিরোজিও-শিষ্যগণের মধ্যে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া আছেন। ইহাদের সঙ্গে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রত্যেকেই কৃতী পুরুষ, কিন্তু ইহাদের বিস্তৃততর পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে, তাই তাঁহাদের নামগুলির উল্লেখমাত্র করিলাম। বৈষ্ণব কবিগণ যেমন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই সব মনস্বী তেমনি কেহ বক্তৃতা দিয়া, কেহ প্রবন্ধ লিখিয়া, কেহ পত্রিকা প্রকাশ করিয়া, কেহ কেহ বা স্বীয় নির্ভীক আচরণ দ্বারা পরবর্তী যুগের প্রতিভাবান কবি ও লেখকদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল মধুসূদনের যুগ তবেই আসিয়াছে। ইহার মধ্যে বাংলায় স্কুল, কলেজ, নানাবিধ এসোসিয়েশন তো হইয়াছেই, স্ত্রী-শিক্ষারও

ভিত্তিপত্তন হইয়াছে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে বাংলায় নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, ক্রিশ্চান ধর্মকে রোধ করিবার জন্য সদ্য-স্থাপিত ব্রাহ্ম সমাজ আদর্শ হিন্দু সমাজ সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শুধু ইঁহারাই নহেন, ভবিষ্যতে যাঁহারা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব বিভাগেই নেতৃত্ব করিবেন, তাঁহারাও ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। যে উর্বর ক্ষেত্র প্রেরণা-বীজের অভাবে এতকাল পূর্ণ-ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রেরণায় সে ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলিল। এই সব অলোক-সামান্য প্রতিভাধরের নেতৃত্বে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের যে গৌরবময় যুগ আরম্ভ হইয়াছিল তাহার সমারোহ আজও অব্যাহত আছে। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অমর গ্রন্থ "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যকীর্তি 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। এখন ১৯৫৭। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়স সবে এক শত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এই স্বল্পকালের মধ্যে বাঙালীর সাহিত্যপ্রতিভা বঙ্গভারতীকে যে ঐশ্বর্যসম্ভারে মণ্ডিত করিয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে নাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাধকদের সম্যক পরিচয় দিবার সুযোগ এ প্রবন্ধে নাই। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের অস্ত-কিরণ-ছটা বাংলার সাহিত্যাকাশকে এখনও রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের সমকালীন কবি ও সাহিত্যিকদের সহিত কিছু পরিচয়ও আপনাদের নিশ্চয় আছে, সুতরাং তাহা লইয়া আমি কালক্ষেপ করিব না। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের পরে যে সব সাহিত্য-সাধক বঙ্গবাণীর সেবায় নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সৃষ্টির গতি-প্রকৃতির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস

পাইব। এই সব সাহিত্য-সাধকের সাধনা এখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন শেষকথা বলিবার সময় ইহা নয়। তবে একটা কথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে, অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অপক্ষপাত বিচার করিলে হতাশ হইতে হইবে না। সমাজে একদল লোক সর্বদাই থাকেন যাঁহারা বর্তমানের মধ্যে ভাল কিছু দেখিতে পান না, যাঁহাদের মন অতীতকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতে ভালবাসে। এ ধরনের হতাশাবাদী সমালোচক মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের যুগেও ছিলেন এবং নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "কিছুই হচ্ছে না, যা হচ্ছে সব বাজে।" কিন্তু কিছু যে হইয়াছে তাহার অকাট্য প্রমাণ আজ আমরা পাইয়াছি। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও কিছু হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরও বাংলার সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে নূতন সুর বাজিয়াছে, নূতন রঙ ফুটিয়াছে। আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতায় অতি-আধুনিক উপন্যাস ও গল্পসাহিত্য শুধু বাংলার নয় শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের দরবারে সম্মান পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। তাহারা নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে, নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়াছে। প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ-কাহিনীও অতি-আধুনিক রূপকারদের লেখনীতেই অনবদ্য কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। অতি-আধুনিক গল্প-সাহিত্যই বেশী সমৃদ্ধ, কবিতা বা নাটক তাদৃশ নহে। অতি-আধুনিক গল্প-উপন্যাসের ধারাকে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের অব্যবহিত পরবর্তী একদল লেখক তাঁহাদের সৃষ্টিতে ভারতের আদর্শকেই জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। বাঙালীর যে চরিত্র তাহার প্রেমে, আত্মত্যাগে, ক্ষমায়, বীরত্বে, বাঙালীর যে সংস্কৃতি তাহার গ্রামের ঘাটে মাঠে হাটে মেলায় নৃত্যে গীতে পটে পুতুলে জীবন্ত হইয়া আছে, যে সামাজিক পীড়নে রাজনৈতিক অত্যাচারে ইহারা বিপন্ন, সেই

সবেরই শিল্পান্বিত রূপ ইহাদের রচনায় পরিস্ফুট। ইহার পর দ্বিতীয় আর একদল লেখকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যাঁহারা বিগত মহাযুদ্ধের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজেরা প্রত্যক্ষ-ভাবে যুদ্ধ করেন নাই, যুদ্ধজনিত দুর্দশাও ভোগ করেন নাই, কিন্তু ইউরোপের যে সব লেখক ও কবি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলভাগী হইয়া, সভ্যতার ছদ্মবেশের অন্তরালে ঘৃণ্যতম পাশবিকতার রূপ দেখিয়া সভ্যতা, আভিজাত্য ও মনুষ্যত্বের সম্বন্ধেই আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই জন্যই যাঁহাদের লেখায় নাস্তিক্যবাদ হতাশা এবং যথেচ্ছাচারের সুর স্বাভাবিক ভাবেই বাজিয়াছে, এই দ্বিতীয় দলের লেখকেরা তাঁহাদের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যেও সেই মাল আমদানি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ও-দেশের এই-জাতীয় লেখকদের সম্বন্ধে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁহার "লীনিং টাওয়ার" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পিতৃধনে শিক্ষালাভ করিয়া পিতৃবিত্তে নির্ভরশীল হইয়া আভিজাত্যের উচ্চ মীনারে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই উচ্চ মীনার হইতে তাঁহাদের দৃষ্টি ও কল্পনা জীবনের ও সমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিত তাহাই প্রধানত তাহাদের সৃষ্টির মূলধন ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধ বাধিতেই সেই মীনারের ভিত্তিতে আঘাত লাগিল, ফলে মীনারটি আর সোজা দাঁড়াইয়া রহিল না, ক্রমশ হেলিয়া পড়িতে লাগিল। এই হেলিয়া-পড়া মীনার-চূড়ায় যে সব লেখক-লেখিকা বসিয়া আছেন তাঁহারা সেখান হইতে নামিতেও পারিতেছেন না, কিন্তু সেখানে বসিয়া স্বস্তিও পাইতেছেন না, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমশ বক্র হইয়া যাইতেছে, সহজভাবে তাঁহারা আর কিছুই দেখিতে পারিতেছেন না। শুধু তাই নয়, যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এই যুদ্ধের জনক, তাঁহারা নিজেরাও সেই

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ফল। তাই আত্মধিক্কারেও তাঁহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ, আত্মবিশ্বাসও তাঁহাদের আর নাই। সুতরাং সত্য-শিব-সুন্দর, প্রেম-ক্ষমা-ত্যাগ কোন কিছুতেই আর তাঁহারা আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। সবই তাঁহাদের নিকট অর্থহীন। তাঁহাদের বিপর্যস্ত বিকৃত মনের পরিচয় তাই তাঁহাদের রচনাতেও বর্তমান। তাঁহাদের লেখা কবিতাতে ছন্দ-মিলের কোনও বালাই নাই, অর্থও নাই।" যুদ্ধোত্তর বিদেশী সাহিত্যিকদের এই বিভ্রান্তি এই দ্বিতীয় দলের লেখকদের মনে সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহার ফলে নাস্তিক্য-বাদ, অর্থহীন গদ্য-কবিতা, মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস, মহৎকে বৃহৎকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, নিছক পশুত্বকেই নগ্ন করিয়া প্রকাশ করিবার আগ্রহ এইসব লেখকের রচনায় দেখা গিয়াছে। বিদেশী লেখকেরা যুদ্ধের কবলে পড়িয়া অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, ইঁহারা তাঁহাদের নকল করিয়া পাগলামির ভান করিতেছেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। মিলটন হোমার টাসো মাইকেল মধুসূদনকে, স্কট বঙ্কিমকে এবং বায়রন নবীনচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন, অতি-আধুনিক কবিরা ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন—বিদেশের দ্বারে এখনও অনেক বাঙালী লেখক নূতন প্রেরণার জন্য ধরনা দিয়া থাকেন। এই অতি-আধুনিক বিদেশী কবিদের প্রেরণা যদি মিলটন হোমার টাসো স্কট বায়রনের প্রেরণার মতো সুস্থ হইত তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন সুর বাজিত, কিন্তু এখন যাহা বাজিতেছে তাহা বেসুরা, কারণ যাহার অনুকরণ করা হইতেছে তাহাই যে সুর-হীন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই লেখকরা অনেকেই শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে অনেকে এখন বুঝিতেও পারিয়াছেন যে, বিদেশী 'কারি পাউডার' দিয়া স্বদেশী ব্যঞ্জনের ঠিক স্বাদটি আনা যায় না। দুই-একজন একেবারে মত ও পথ পরিবর্তনও করিয়াছেন।

বাংলার গল্প-সাহিত্যে তৃতীয় যে ধারাটি লক্ষ্য করা যায় সেটির উৎস বিদেশী রাজনীতি, প্রধানত কম্যুনিজ্‌ম্। সাম্যবাদ ভারতবর্ষেরও প্রাচীন আদর্শ, কিন্তু রুশীয় কম্যুনিজ্‌ম্ এবং ভারতীয় সাম্যবাদে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভারতীয় সাম্যবাদ আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, রুশীয় কমিউনিজ্‌মের ভিত্তি বিষয়-বাসনা দীন-দরিদ্র চাষী-মজুর নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা হর্ষ-বেদনা লইয়া কাব্যরচনা বাংলা সাহিত্যে নূতন নহে, মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এ কাব্যরস আমরা উপভোগ করিয়াছি, শরৎচন্দ্রের অমর লেখনীও ইহাদের কথাই চিত্রিত করিয়াছে। কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা শরৎচন্দ্রের লেখা পড়িলে মনে হয় যে, দেশের মাটির সহিত সে সব কাব্যের যোগ আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পরে যে সব লেখক শ্রমিকদের লইয়া কাব্যরচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন তাঁহাদের লেখা পড়িয়া মনে হয় না যে তাঁহারা এই শ্রমিকদের সুখদুঃখের অংশীদার। বরং মনে হয়, গল্প বলিবার ছলে তাঁহারা যেন শ্রমিকদের স্বপক্ষে ওকালতি করিতেছেন। সেই জন্য অনেকক্ষেত্রেই কাব্যের সুরটা ঠিক জমে নাই। এ গোষ্ঠীর মধ্যেও অনেক শক্তিমান লেখক আছেন, অনেকের মনীষা এবং বিদ্যাবত্তাও সম্মানযোগ্য, কিন্তু ইঁহাদের লেখায় সৃষ্টিধর্মী কাব্যের সুর তেমন জমে নাই। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্যে গোর্কি বা শলোকভের দেখা আমরা এখনও পাই নাই।

সম্প্রতি আর একদল নবীন লেখকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাঁহারা প্রথমোক্ত দলের মতো ভারতবর্ষের আদর্শে বিশ্বাসবান, দেশের জল মাটি মানুষকেই যাঁহারা কাব্যের উপকরণ করিয়াছেন, কোন 'ইজ্‌ম্' বা ঢং ইহাদের প্রভাবিত করে নাই। ইঁহারাই সাহিত্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন।

সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে বাংলা কবিতা ও নাটকের মান কিন্তু অনেক নামিয়া গিয়াছে। গদ্য-কবিতা বলিয়া যাহা মাসিকের পৃষ্ঠায়

আত্মপ্রকাশ করে তাহা কবিতা নয়, অদ্ভুত হেঁয়ালি মাত্র। তবে সুখের বিষয়, তাহারা ক্রমশ বিলীন হইতেছে, তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে প্রকৃত কবিতা। কয়েকজন শক্তিশালী তরুণ কবির দেখা আমরা পাইয়াছি, কিন্তু এখনও কিছুদিন না গেলে তাঁহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাল নাটকেরও খুব অভাব আছে। ইহার কারণ, পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলির সহিত কোনও প্রতিভাবান নাট্যকার সংশ্লিষ্ট নাই। পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, তাঁহাদের লক্ষ্য অর্থোপার্জন, দর্শকদের রুচির মান উন্নীত করা নয়। জাতীয় নাট্যশালা না হইলে এবং সে নাট্যশালায় প্রতিভাবান নাট্যকারদের সম্মানের স্থান না দিলে আমাদের নাট্যসাহিত্যের উন্নতির আশা নাই।

মোটামুটি ইহাই বর্তমান সৃষ্টিধর্মী বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আর একটা বড় দিক গড়িয়া উঠিতেছে, যাহার উল্লেখ না করিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিবে। সে দিকটি উপকরণ-সংগ্রহের দিক। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে অনেক সাধক ও গবেষক ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিধান ও পরিভাষা বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য সাহিত্য-সমালোচনা, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি বিষয়েও পুস্তক রচিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের জীবনী-সাহিত্যও বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অনেক বিলুপ্ত-প্রায় পুস্তক প্রকাশ করিয়া সেগুলিকে আবার সাধারণের গোচরে আনিয়াছেন। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে পথে অগ্রণী ছিলেন সে পথে এখন অনেক যোগ্য সাধকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে আমরা দেখিয়াছি যে, সে যুগে বাঙালী মনীষীরা প্রধানত উপকরণ-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন এবং সেই

উপকরণের ভিত্তির উপরই আধুনিক সাহিত্যের হর্ম্য নির্মিত হইয়াছে। বর্তমান যুগের সাহিত্য-সাধকরা যে সব মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন তাহাও যে ভবিষ্যৎ সাহিত্য-স্রষ্টাদের সৃষ্টিকর্মে সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের বয়স প্রায় এক হাজার বৎসর। ইহার মধ্যে আমরা নয় শত বৎসর কাটাইয়াছি কবিতা লইয়া এবং সে কবিতার প্রধান বিষয় দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন, সর্প-ব্যাঘ্র-কুম্ভীরের মধ্যেও দেবত্ব আরোপ করিয়া আমাদের প্রাচীন কবিরা কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। বাংলা গদ্যযুগ আরম্ভ হইবার পর হইতেই, অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত সংঘর্ষের পর হইতেই আমাদের কাব্যলোক হইতে দেব-দেবীরা নির্বাসিত হইয়াছেন এবং আমাদের মনে হইতেছে আমরা কুসংস্কার বর্জন করিয়া যুক্তিবাদী হইয়াছি; এখন মানুষই আমাদের কাব্যের একমাত্র আশ্রয়। ইহার স্বপক্ষে আমরা প্রায়ই এই কবিতাটি উদ্ধৃত করি—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

বড়ু, দ্বিজ, দীন চণ্ডীদাস যিনিই এ কবিতার রচয়িতা হউন তিনি নিজেই ছিলেন একজন দেব-দেবী-মাহাত্ম্য-কীর্তনকারী কবি। মনে প্রশ্ন জাগে, তবে তিনি হঠাৎ এমনভাবে মানব-বন্দনা করিলেন কেন? ইহার উত্তর, কবিরা চিরকালই শক্তির উপাসক, সে শক্তি দেব-দেবী বা মানব-মানবী যে রূপেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, কবির প্রশস্তি সে লাভ করিবেই। শক্তিময়ী রজকিনী রামীর প্রেমই উক্ত কবিতার উৎস—এ কথা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে লিখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের উক্তি —"শত শত বাশুলী তাঁহাকে যে প্রেম শিখাইতে পারিতেন না, ব্রহ্মা

স্বয়ং আসিয়া যে জ্ঞান দিতে পারিতেন না, রামী তাঁহাকে তাহা দিয়াছে।" সুতরাং যে মানুষের বন্দনা তিনি গাহিয়া গিয়াছেন সে মানুষ সাধারণ মানুষ নহে, সে মানুষ দেবত্বের স্তরে উন্নীত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালের মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেব-দেবীদের দ্বন্দ্ব-কলহের যে চিত্র আমরা পাইয়া থাকি, সে চিত্রের কল্পনা কবিরা দেব দেবীদের মধ্যে ততটা পান নাই—যতটা পাইয়াছিলেন আন্দোলিত নিষ্পিষ্ট জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ মানসের মধ্যে। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "চণ্ডী যেমন প্রচণ্ড উপদ্রবে আপনার পূজা প্রতিষ্ঠা করেন মনসা শীতলাও তেমনি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শৈব চাঁদ সদাগরের দুরবস্থা সকলেই জানেন। বিষহরি, দক্ষিণরায়, সত্যপীর প্রভৃতি আরও অনেক ছোটখাটো দেবতা আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন নাই। এমনি করিয়া সমাজের নিম্নস্তরগুলি প্রবল ভূমিকম্পে সমাজের উপর উঠিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।" ইহার সরল অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে, নিম্নস্তরের এক-একটি মানবগোষ্ঠীর এক-একটি দেব বা দেবী প্রতীকস্বরূপ ছিল এবং সেকালের মঙ্গলকাব্যগুলি সেই প্রতীকগুলিরই প্রশস্তি-কাব্য। আজ যে আসনে আমরা জাতীয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি পুরাকালে সেই আসনেই দেব-দেবীরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দেব-দেবীরা সাহিত্য বা কাব্য হইতে এখনও নির্বাসিত হন নাই, কেবল ভিন্ন নামে আমরা তাঁহাদের পূজা করিতেছি মাত্র। ভারতবর্ষের জনসাধারণের চিত্তে তাঁহারা স্বনামেই এখনও সগৌরবে বিরাজ করিতেছেন। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মন্দিরে লক্ষ লক্ষ দেবতার সম্মুখে আজও লক্ষ লক্ষ নরনারী করজোড়ে সাশ্রুনেত্রে প্রণাম করিতেছে। সাহিত্য লইয়া যাঁহারা ব্যবসায় করেন তাঁহারাও বলেন, রামায়ণ মহাভারত গীতা উপনিষদ পুরাণ ভাগবতের ক্রেতার অভাব নাই, যতই ছাপা যায় ততই বিক্রয় হইয়া যায়। আধুনিক কোনও সাহিত্য-পুস্তক এতটা জনপ্রিয়তার দাবী করিতে পারে না।

সিনেমার যুগেও যাত্রা উঠিয়া যায় নাই, পৌরাণিক দেব-দেবীদের গল্পই সে সব যাত্রাকে আজও টিকাইয়া রাখিয়াছে। আজকাল সিনেমার বিষয়বস্তুও পৌরাণক গল্প হইলে তাহা বেশী জনপ্রিয় হয়। আমাদের সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে দেবগুণবর্জিত হইলে সংবাদপত্রের মতো ক্ষণস্থায়ী হইত। নিতান্ত-মানবীয় বাস্তবধর্মী সাহিত্যে ক্ষুধিত চিত্তের জন্য চিরন্তন সুধা সঞ্চিত হইয়া থাকে না। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর লেখকদের কাব্য হইতে এমন অনেক উদাহরণ আহরণ করা যাইতে পারে. যাঁহারা নামেই মানুষ কিন্তু আসলে যাঁহারা দেব-দেবীরই সমগোত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, দেবীচৌধুরাণী, শ্রী, ভ্রমর, জগৎ সিংহ, ভবানী পাঠক, সত্যানন্দ, সীতারাম; রবীন্দ্রনাথের পরেশ, আনন্দময়ী, গোরা নিখিলেশ, সুচরিতা, হৈম; শরৎচন্দ্রের বিন্দু, সিদ্ধেশ্বরী, গিরীশ নরেন, প্রিয়বাবু, কৈলাস, সব্যসাচী প্রভৃতি চরিত্রের অন্তরালে কি দেব-দেবীরা লুকাইয়া নাই? নিশ্চয়ই আছেন। সাহিত্যে কাব্যে পুরাণে এই দেব-দেবীদের অলৌকিক মহিমাচ্ছটাই অন্ধকারে আমাদের পথ দেখাইতেছে। আমরা নিতান্তই অসহায়, দেব-দেবীরা আজও আমাদের ভরসা। সর্বদেশের কাব্যেই যুগে যুগে তাঁহারা নানা মূর্তিতে প্রকাশিত। পৃথিবীর আধুনিকতম প্রথম শ্রেণীর কাব্যগুলিও মঙ্গলকাব্য, কারণ সমস্ত প্রথম শ্রেণীর কাব্যেরই লক্ষ্য—মানবজাতির মঙ্গল, সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ।

আপনাদের এই সম্মেলন শুধু সাহিত্য-সম্মেলন নহে, সংস্কৃতি সম্মেলনও বটে। তাই সংস্কৃতি বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

অনেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, কিছু পার্থক্য আছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির আধার-আধেয় সম্পর্ক। যদি ফুলের উপমা দিয়া বলা যায় তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ফুলের পাপড়ি বৃন্ত বর্ণ, যে গাছে বা লতায়

সে ফুলটি ফুটিয়াছে তাহার স্বরূপ প্রভৃতি সভ্যতা, কিন্তু ফুলের রূপ এবং সৌরভটি সংস্কৃতি। যদি প্রদীপের উপমা দিই তাহা হইলে বলিতে হইবে, প্রদীপের আকৃতি, গঠন-কৌশল, উপাদান, প্রদীপের পিলসুজ, তৈল, সলিতা, যে গৃহে যে পরিবেশে তাহা স্থাপিত হইয়াছে তাহার স্বরূপ প্রভৃতি সভ্যতা, কিন্তু প্রদীপের আলোটি সংস্কৃতি। মানবসমাজে সভ্যতার রূপ যুগে যুগে বদলাইয়াছে, আমরা পূর্বে গরুর গাড়ি চড়িতাম, এখন প্লেনে চড়িতেছি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেদের সহিত সংমিশ্রণের ফলে সভ্যতার বেশ নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে। দশম বা একাদশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের সহিত বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের বাহিরের চেহারায়, বাহ্যিক সামাজিকতায় অনেক অমিল আছে। কিন্তু চরিত্রের, চিন্তার, আচরণের যে দীপ্তিকে যে মাধুর্যকে যে সৌরভকে আমরা সংস্কৃতি বলি তাহা কি খুব বেশী বদলাইয়াছে? অতি প্রাচীন কালেও যে সকল মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী সুসংস্কৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইত, আজও সেই.সকল গুণাবলীর দ্বারাই আমরা সংস্কৃতির বিচার করি। পুরাকালে আর্য-ঋষিরা যে চারিত্রিক সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণত্ব আখ্যা দিয়াছিলেন, আজও প্রকৃত ব্রাহ্মণের মধ্যে সেই চারিত্রিক সংস্কৃতি বিদ্যমান। অর্থাৎ সংস্কৃতির প্রকৃত উৎস আত্মজ্ঞানে, আত্মসংযমে এবং আত্মত্যাগে। সভ্যতার বহিরঙ্গের নানা পরিবর্তন যুগে যুগে ঘটিয়াছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিব এই প্রচীন আদর্শ আজও বদলায় নাই। তাই আজ সুসভ্য বিংশ শতাব্দীর বিকারগ্রস্ত অহঙ্কার-স্ফীতিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের প্রধান মন্ত্রী নেহরু পঞ্চ-শীলের যে বাণী আজ ঘোষণা করিতেছেন তাহা প্রাচীন ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতিরই বাণী, তাহা ভগবান বুদ্ধের বাণী, তাহা আজও পুরাতন হইয়া যায় নাই, পৃথিবীর সন্ত্রস্ত মানব-সমাজ সে বাণী আজ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে।

ব্রহ্মদেশের সহিত বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহু প্রাচীন। ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়া নিঃসংশয়ে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রধানত ভগবান বুদ্ধের বাণীই আমাদের উভয় দেশকে আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সম্রাট অশোকের প্রেরিত আচার্য ব্রহ্মদেশে আসিয়া যে মিলন-সেতু নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা আজও অটুট আছে।

পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন, বাঙালী জাতি, বাঙালী সমাজ, বাঙালীর আহার-বিহারের অনেক বৈশিষ্ট্য, এমন কি বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য দ্রবিড়, নিগ্রোবটু, অস্ট্রিক, ভোটচীন, মঙ্গোলীয়, আর্য, পাঠান, মোগল এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতার নিকট ঋণী। ব্রহ্মদেশবাসীদের সম্বন্ধেও ইহা অনেকাংশে সত্য। সেদিক দিয়া বিচার করিলে ইহাদের সহিত আমাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। সম্প্রতি মার্কিন এবং সোভিয়েট সভ্যতার প্রভাবও আমাদের উভয় দেশের উপর পড়িয়াছে। এই যুগল প্রভাবকে আত্মসাৎ করিয়া আমরা কালক্রমে তাহাদের নবরূপ দান করিব তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেই নবরূপের মধ্যেও মানবজাতির সনাতন সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যাহা মানব-পশুকে মহামানব হইবার প্রেরণা দিয়াছে তাহা তাহার চির-জ্যোতির্ময় রূপে সভ্যতার সেই নব-প্রকাশকেও শাশ্বত মহিমায় মণ্ডিত করিবে। বাহির হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া জাতির এই নিত্যনব অথচ শাশ্বত প্রকাশই সংস্কৃতি, ইহাই তাহার জীবন্ত অস্তিত্বের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। এই প্রকাশের দেবতাই বাণী, এবং কবিই সে বাণীর বার্তাবহ। ইহা লইয়া বহুকাল পূর্বে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।—

প্রকাশের বেদনায় বিদীর্ণ হয়েছে হিমালয়
প্রস্তর-পঞ্জর ভেদি' লক্ষধারা হয়েছে বাহির।

প্রপাতের কলোল্লাসে
নির্ঝরের সঙ্গীত-ধারায়
তরঙ্গিছে পাষাণের বিগলিত আত্ম-নিবেদন,
'আমি আছি, আমি আছি
শোন, শোন, আমি আছি আছি'
উদ্বেলিত সমুদ্র-সঙ্গমে
সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র তারস্বরে করিছে ঘোষণা,
'হে সমুদ্র আমি আছি,
অতিক্রমি' বহুদূর পথ
আসিয়াছি অবশেষে
বহি এই চিরন্তনী বাণী
তুমি আমি ভিন্ন নহি,
আমারে গ্রহণ কর, অবলুপ্ত নিমজ্জিত কর
হে বিরাট, অন্তরে তোমার।'

২

প্রকাশের বেদনায় উন্মুখ অধীর হিমালয়;
অনন্ত নিখিল শূন্যে সমুৎসুক চূড়ায় চূড়ায়
অতি দূর তুঙ্গলোকে
সন্ধানিছে নব ছন্দ, নবতর ভাষা
আত্মপ্রকাশের।
ভাব-মৌন শান্ত শুভ্রতায়,
গম্ভীর গর্জনে কভু ঝঞ্ঝা-আলোড়নে,
বাণী তার শূন্যে শূন্যে মাগিছে প্রকাশ
তন্দ্রাহীন নিত্য নবরূপে।
সে-ও কহিতেছে,
'আমি আছি, আমি আছি
শোন, শোন, আমি আছি আছি'—

রাধানাথে, গৌরীশৃঙ্গে, কাঞ্চনজঙ্ঘায়
ঊর্ধ্বমুখী অসংখ্য চূড়ায়
অবিরাম চলেছে ঘোষণা,
'হে আকাশ, আমি আছি,
অতিক্রমি বহু বিঘ্ন বাধা
আসিয়াছি এতদূর বহি এই চিরন্তনী বাণী
তুমি আমি ভিন্ন নহি।
যে বহ্নি তোমার ওই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রেরে করেছে উজ্জ্বল
সেই বহ্নি মোরও শিরে পরায়েছে তুষার-মুকুট।
যে পূর্ণতা শূন্যতায় হয়েছে অসীম তোমার অনন্ত বক্ষে,
সেই পূর্ণতাই আমারে দিয়াছে সীমা ;
তুমি আমি ভিন্ন নহি
আমারে গ্রহণ কর, অবলুপ্ত নিমজ্জিত কর
হে বিরাট, অন্তরে তোমার।'

৩

কবির অন্তরলোকে ধ্বনিত হইল মহাবাণী।
অতি ক্ষুদ্র জড় হিমালয়
প্রকাশের আবেগেতে
সাগরের আকাশের সন্ধান পাইয়া থাকে যদি,
হে মানব,
তোমার সন্ধান হবে নাকি মহত্তর আরও ?
তোমার কল্পনা
অঙ্কিত করিবে নাকি মহাকাল-ভালে
নিষ্কলঙ্ক নব চন্দ্র-লেখা ?
নবীনা উমার ক্রোড়ে নবীন কুমার সম্ভব হইবে না কি।
নব-প্রেরণায় করিবে না নব-সৃষ্টি তুমি
দূর করি' সর্ব মলিনতা ?

নিখুঁত নবীন-সৃষ্টি-পরিকল্পনার
তুমিই তো একমাত্র যোগ্য অধিকারী
হে কবি, হে সৃষ্টিকর্তা
জাগো, তুমি ওঠ— ।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ।

সিপাহী বিদ্রোহ

বীর সাভারকর সিপাহীবিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বস্তুত, পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ বিতাড়নের সর্বভারতীয় ব্যাপক প্রচেষ্টা সিপাহীবিদ্রোহেই প্রথম মূর্ত হইয়াছিল। খণ্ড খণ্ড ভাবে এ প্রচেষ্টা অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের পর এই বাঙলা দেশেই একাধিকবার হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ জঙ্গল মহালের বিদ্রোহ, ঝাড়গ্রাম-ঘাটশীলার যুদ্ধ, বীরভূমের যুদ্ধ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসব সংগ্রামে যাঁহারা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বীরত্বও কিছু কম ছিল না। নরহরি চৌধুরী, মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, গোবর্ধন দিকপতি, অচল সিংহ, তিতু মীর, রামা ও সুন্দরা মাঝির অদ্ভুত রণকৌশল ও একাগ্র দেশাত্মবোধ, নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী ও লছমীবাইয়ের রণকৌশল ও দেশাত্মবোধ অপেক্ষা কিছু কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই সকল বিদ্রোহ নিখিল ভারতীয় মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাদের কার্যকলাপ প্রদেশ-বিশেষেই সীমাবদ্ধ ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের ব্যাপ্তি ছিল আরও অনেক বেশি। বাংলা, বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই, বুন্দেলখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এই সমস্ত অঞ্চলেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল। অনেক স্থানে ইংরেজশাসন বলিয়া কিছু ছিল না। শুধু সিপাহীরা নহে, দেশের জনসাধারণও অনেক স্থানে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহকে অংশত গণবিপ্লবও বলা চলে।

বিদ্রোহের প্রধান কারণ বিদেশীশাসনে অসন্তোষ। বিদ্রোহীদের একটি ঘোষণাপত্রে লেখা ছিল—"মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু তাহার ধর্ম, তাহার জাতি, তাহার আত্মসম্মান, তাহার নিজের ও প্রিয়জনের প্রাণ এবং তাহাদের ধনসম্পত্তি। ব্রিটিশ শাসনে ইহার একটিও নিরাপদ নহে।"

এই বিদ্রোহে আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল—হিন্দু-মুসলমানে মৈত্রী। অনেক মুসলমান নেতা গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সম্রাট সরাসরি গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিবার নির্দেশও দিয়াছিলেন। এই সময় সম্রাট বাহাদুর শাহ, জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, আলোয়াড় প্রভৃতি হিন্দু রাজাদিগের নিকট স্বহস্তে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত অশোক মেটার "আঠারো শ' সাতান্নর বিদ্রোহ" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সম্রাট লিখিয়াছিলেন—যে-কোনও উপায়ে হিন্দুস্থান থেকে ফিরিঙ্গীদের তাড়িয়ে দেওয়াই আমার অভিলাষ। সমগ্র হিন্দুস্থান স্বাধীন হোক এই আমার ইচ্ছা। কিন্তু দেশের জনগণকে সংঘবদ্ধ করতে পারে, তাদের আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দিতে পারে, তাদের শক্তিকে যথাযথরূপে নিয়োজিত করতে পারে, আন্দোলনের ভার বহনে সক্ষম এমন একজন নেতা এগিয়ে না এলে বিদ্রোহ সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের পরেও রাজত্ব করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নেই আমার। যদি আপনারা সমস্ত দেশীয় নৃপতিরা মিলে শত্রুকে তাড়াতে অস্ত্রধারণ করেন তবে আপনাদের সম্মতিক্রমে গঠিত যে-কোন নৃপতিমণ্ডলের হস্তে শাসনভার অর্পণ ক'রে সিংহাসন ত্যাগে আমি প্রস্তুত।"

ইহার পরেই শ্রীযুক্ত মেটা লিখিয়াছেন—"হিন্দুরাও মুসলমানের বন্ধুত্ব-অর্জনে সমপরিমাণ আগ্রহ ও ঔদার্য দেখিয়েছে। কানপুরে

নানাসাহেব যখন তাঁর পৈত্রিক পতাকা 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা' উত্তোলন করলেন, তখন তার পাশে ছিল অর্ধচন্দ্র-অঙ্কিত মুসলিম পতাকা। তিনি যে ঘোষণা প্রচার করলেন তাও সম্রাট বাহাদুর শাহের নামে। নেপালের মহারাজা জংবাহাদুরের সঙ্গে সে সময় তাঁর যে পত্র ব্যবহার হয়েছে তার সবগুলিতেই ছিল হিজরী সালের তারিখ। নানাসাহেবের উপদেষ্টা এবং মন্ত্রী ছিলেন একজন মুসলমান—আজিমুল্লা খান। বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত একই সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে রণক্ষেত্র রঞ্জিত করেছে।"

প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধে আমরা যখন পরাজিত হইলাম তখন কিন্তু এই মৈত্রীতে ফাটল দেখা গেল। ইংরেজের ভেদ-নীতিই এই ফাটল সৃষ্টি করিল। দেশে পুনরায় যখন ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল তখন ইংরেজরা হিন্দুদের অনুগ্রহ এবং মুসলমানদের নিগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এই ব্যাপার চলিল। সিপাহীবিদ্রোহের সময় মুসলমানরা যে মৈত্রীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা মায়া-মরীচিকার মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। রাজানুগৃহীত হিন্দুদের দিকে তাকাইয়া স্বভাবতই তাহাদের মনে হইল উহারা আমাদের কেহ নন। উহাদের বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের মুখোশমাত্র। হিন্দু-মুসলমানের এ বিচ্ছেদ আজও জোড়া লাগে নাই। বন্ধুত্বের পর যে বিচ্ছেদ হয় তাহা মর্মান্তিক, তাহার তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা সহজে ঘোচে না। সিপাহীবিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমানের সেই মৈত্রী এবং ইংরেজদের চক্রান্তে সে মৈত্রীর বিনষ্টির ফলভোগ আজও আমরা করিতেছি। মহাত্মা গান্ধী খিলাফত আন্দোলন করিয়াছিলেন, সাময়িকভাবে তাহাতে সামান্য কিছু ফল ফলিয়াছিল, কিন্তু সে ফল পাকে নাই, ঝরিয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুরা যে মুসলমানদের প্রতি নিগ্রহ নীরব দর্শকদের মত নিরীক্ষণমাত্রই করিয়াছিল একথা মুসলমানেরা আজও ভুলিতে পারে নাই। সেই আক্রোশের ফল মুসলিম লীগ মিস্টার জিনা এবং পাকিস্তান।

একশত বৎসর পূর্বে সিপাহীবিদ্রোহ হইয়াছিল, তির্যকভাবে তাহার ফলভোগ আমরা আজও করিতেছি।

সিপাহীবিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত বাঙলা দেশের মাটিতেই হয়। ব্যারাকপুরে এবং বহরমপুরেই প্রথমে চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা যায়। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীর নিক্ষিপ্ত গুলিই বিদ্রোহের উদ্বোধন করে। একজন Adjutant নিহত হন। দশ দিন পরে মঙ্গল পাণ্ডেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক মুখ্য ব্যাপারে বাঙলা দেশ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে, সিপাহীবিদ্রোহের ব্যাপারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিহার তখন বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরার নিকটবর্তী জগদীশপুরের কুনওয়ার সিং বিদ্রোহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যে এত বড় বিদ্রোহের কোন উল্লেখযোগ্য ছাপ নাই। মাইকেল মধুসূদন তখন রত্নাবলী নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করিতেছিলেন। বাঙলা দেশে তখন 'ইয়ং বেঙ্গল'দের যুগ। বাঙলার নবজাগ্রত মনীষা তখন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, 'সাহেব' হইতে পারিলেই বুঝি আমাদের দুঃখদুর্দশা ঘুচিবে। তাই সম্ভবত সাহেবদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই বিদ্রোহকে তাহারা সুচক্ষে দেখেন নাই। পঞ্চাশ বৎসর পরে কিন্তু চাকা ঘুরিয়াছিল। বাঙালী ক্ষুদিরামের হাতেই প্রথম বোমা ইংরেজের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

সিপাহীবিদ্রোহে আমাদের পরাজয় কেন হইল ঐতিহাসিকগণ তাহা বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরাজয়ের কারণ এইগুলি—

(১) সিপাহীদের বন্দুক সাহেবদের বন্দুকের মত দূর-পাল্লার ছিল না।

(২) টেলিগ্রাফ এবং ডাক-বিভাগ ব্রিটিশদের অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

(৩) সাহেবদের সেনানায়করা অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও দক্ষ ছিলেন। বুদ্ধিমান এবং দক্ষ সেনানায়করা সংখ্যাতেও ছিলেন অনেক। সিপাহীদের পক্ষে সুদক্ষ সেনানায়কের অভাব ছিল।

(৪) সাহেবরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সিপাহীদের সে পদ্ধতি তেমন জানা ছিল না। তাঁহারা সেকেলে মধ্যযুগীয় রীতিতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

(৫) অনেক বিদ্রোহী সিপাহী এমন ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছিল যে, জনসাধারণের সহানুভূতি ক্রমশ তাহারা হারাইতে থাকে। অনেক গুণ্ডা ও ডাকাত-জাতীয় লোক এই সুযোগে ভদ্র-গৃহস্থের উপর নির্যাতন করিয়াছিল। সেজন্য অনেক স্থানেই বিদ্রোহ জনসাধারণের সমর্থন পায় নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের প্রকৃত স্বরূপ কি এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ইহা জঙ্গী (Military) বিদ্রোহ মাত্র। অনেকে আবার বলেন, রাজ্যচ্যুত রাজাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভ এবং আক্রোশই ইহার কারণ। জাতীয় জাগরণের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার। এক বা একাধিক ব্যক্তির নিতান্ত ব্যক্তিগত ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গই যে অবশেষে জাতীয় জাগরণের দাবানলে রূপান্তরিত হইয়াছে ইহার নজির ইতিহাসের পাতা উল্টাইলেই পাওয়া যাইবে। বেশি দূর যাইবার দরকার নাই, দেশপূজ্য স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি একজন আই. সি. এস. অফিসারের হাতে লাঞ্ছিত না হইতেন তাহা হইলে কি তিনি এতবড় একটা জাতীয় জাগরণের নেতা হইতে পারিতেন? মূল কারণ যাহাই হোক বিদ্রোহের লক্ষ্য, ব্যাপকতা এবং মহত্ত্বই তাহাকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়া থাকে। এই মানদণ্ডে

বিচার করিলে সিপাহীবিদ্রোহকে আমরা মহতী মর্যাদা দিতে বাধ্য। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র যে ভারতের স্বাধীনতাপ্রয়াসের প্রথম ব্যাপক প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করিতেছেন তাহাতে আমিও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আনন্দিত হইলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র আজ যে গণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন সেই গণতন্ত্রের প্রথম উদ্বোধন হইয়াছিল বাঙলা দেশে অষ্টম শতাব্দীতে। জনগণনির্বাচিত গোপালদেব সে গণতন্ত্রের নায়ক ছিলেন। এতবড় একটা যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক উৎসব করা কি আমাদের কর্তব্য নয়?

প্রেমচন্দ্‌ স্মরণে

আমাদের এই বিশাল ও সুপ্রাচীন দেশের যে ঐতিহ্য অব্যাহত ধারায় আমাদের অতীতের সহিত আমাদের বর্তমানকে সমুজ্জ্বল সংস্কৃতির বন্ধনে সংযুক্ত করিয়াছে সে ঐতিহ্যের মর্মবাণী সত্য-সন্ধান। ভারতীয় সাধকেরা বহুপথে বিবিধ সাধনায় এই সত্যের সন্ধান করিয়াছেন। সে সন্ধানে ধর্ম-পথই একমাত্র পথ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই,—কাব্য শিল্প ও সঙ্গীতও সে সন্ধানের মার্গরূপে ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে সম্মানিত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকার উৎকৃষ্ট কাব্য-স্বাদকে ব্রহ্ম-স্বাদ সহোদর বলিয়াছেন। আমাদের দেশের কাব্যকার, মহর্ষি বাল্মিকী, বেদব্যাস, তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধার্মিক বলিয়া আজও আমাদের পূজা পাইতেছেন। তাঁহাদের সৃষ্ট কাব্যরাজিকেও পূজার সিংহাসনে বসাইয়া আজও আমরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছি। সঙ্গীতও আমাদের নিকট আত্মারই পরম বিকাশ। সেইজন্য হরিদাস, বৈজুবাওরা, নায়ক-গোপাল, তানসেন, অদারঙ্গ, সদারঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতবিশারদগণ আজও আমাদের মানস-মন্দিরে সত্যদ্রষ্টা ঋষি-রূপেই শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য লাভ করিয়া আসিতেছেন। আমাদের সঙ্গীত ও নৃত্যকলার প্রণেতা স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হংসবাহিনী পদ্মারূঢ়া ভারতী। ভাস্কর্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা। বীটপাল ও ধীমান আমাদের নিকট সামান্য পটুয়া বা ভাস্কর মাত্র নহেন, তাঁহারা সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক সত্যদ্রষ্টা যোগী। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত আমাদের দেশে ঋষির আসনে প্রতিষ্ঠিত। এদেশে সত্য-সন্ধানের সাধনা কেবল আনুষ্ঠানিক ধর্মের গণ্ডীতে বা সন্ন্যাসমার্গেই নিবদ্ধ নহে।

রবীন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। আমাদের দেশে এই মুক্তি-সাধনা অনেক বিচিত্র প্রেরণায় বহু বিচিত্র পথে সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সাহিত্য-সাধনা সেই সত্য-অনুসন্ধানেরই একটি পথ।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই এদেশের সাহিত্য-সাধনা—বস্তুত সর্বপ্রকার শিল্প-সাধনাই, যুগে যুগে নানাবর্ণের আলোকে রঞ্জিত হইয়াছে। বেদের যুগ, উপনিষদের যুগ, বৌদ্ধ যুগ, পাঠান যুগ, মোগল যুগ এবং ইংরেজি যুগ—আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভাকে যুগে যুগে নিজ নিজ স্বকীয়তায় আবিষ্ট করিয়াছে। যাঁহারা প্রথম-শ্রেণীর কবি তাঁহারা সেই যুগ-ধর্মের আবহাওয়াতে সেই বিশেষ যুগের মানব-মানবীর আশা-আকাঙ্ক্ষার উপাদান লইয়াই কাব্য-সৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টিতে এমন একটি সুর বাজিয়াছে যাহা শাশ্বত, যাহার বাণী সেই বিশেষ যুগের সহিতই স্তব্ধ হইয়া যায় নাই, যাহা আজও পিপাসিত মানব-মানবীর নিকট চিরন্তন সুধার প্রস্রবণরূপে বিরাজ করিতেছে, যাহার দিগ্‌দর্শন আজও আদর্শ মানব সভ্যতারই দিগ্‌দর্শনরূপে আদৃত।

কবি প্রেমচন্দজী এইরূপ একজন প্রথম শ্রেণীর সত্য-সন্ধী সাহিত্য-সাধক ছিলেন। যে যুগে যে পারিপার্শ্বিকে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি জীবন-যাপন করিয়াছিলেন সে যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা সে যুগের আনন্দ-বেদনা সে যুগের পুণ্য পাপ তাঁহার দিব্য প্রতিভার স্পর্শে শুধু যে অপরূপ কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নয় সে যুগের নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানব-আত্মার মর্মবাণী তাঁহার সৃষ্টিতে আগামী যুগের মানব-সমাজের জন্যও সত্যের পাথেয় রাখিয়া গিয়াছে। সে-সত্য এমনই তীক্ষ্ণ যে তাহা 'ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।'

প্রেমচন্দজীর সমগ্র সৃষ্টির সম্যক আলোচনা করা এ সভায় সম্ভব নহে। বহু যোগ্য লেখক তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। আমি এখানে সংক্ষেপে শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে প্রেমচন্দজী মানবতার কবি ছিলেন। কবি চণ্ডীদাসের মতোই ইনি নিজেব সৃষ্টিতে নিজস্ব ভঙ্গীতে ইহাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' অনেকে প্রেমচন্দজীকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। অনেকে ইহাও বলেন যে তিনি নাকি এদেশের ম্যাক্সিম্ গোর্কি। এসব তুলনা অর্থহীন। কমল কমলই, তাহার সহিত গোলাপের কিছু সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে সাদৃশ্য দ্বারা কমলের মহিমা নির্ণীত হয় না। প্রত্যেক সাহিত্য-স্রষ্টার মতো প্রেমচন্দজীও, নিজের গৌরবে, নিজের মহিমায়, নিজের বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। তাঁহার তুলনা একমাত্র তিনিই।

আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক দলও প্রেমচন্দজীকে আপন আপন স্বগোত্র মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা আমি বলিতেছি না। যে কোনও প্রথম শ্রেণীর লেখকের রচনার এমন একটা সার্বভৌমতা থাকে যে তাঁহার রচনা হইতে যে কোনও লোক, এমন কি শয়তানও নিজের স্বপক্ষে কিছু না কিছু যুক্তি আহরণ করিতে পারেন। প্রথম শ্রেণীর লেখকেরা যে জগৎ সৃষ্টি করেন সে সৃষ্টি ভগবানের সৃষ্টির মতোই বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহাতে উচ্চনীচ, ভালোমন্দ, সর্বশ্রেণীর লোকই থাকে, সেখানে আলো এবং অন্ধকারের সমান আদর; পুণ্যাত্মা বা পাপী, শোষক বা শোষিত তাঁহার সৃষ্টির উপাদান মাত্র, নিখিল জগৎস্রষ্টার মতো কাব্যস্রষ্টাও তাহাদের শিল্প-রূপ দান করিয়া আনন্দিত হন। কিন্তু নিজে তিনি নির্বিকার। যে স্রষ্টা ঈশ্বরের

মতো নিজের সৃষ্টিতে ওতপ্রোত থাকিয়াও নির্লিপ্ত তিনিই প্রথম শ্রেণীর কবি। প্রেমচন্দজী এই শ্রেণীরই কাব্য-স্রষ্টা ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সৃষ্টিতে বিশেষ কোনও রাজনৈতিক মতবাদ অরোপ করিয়া আনন্দ পান তাঁহাদের কথা ভাবিলে অন্ধের হস্তীদর্শনের গল্পটি মনে পড়িয়া যায়। তিনজন অন্ধ একবার একটি হস্তীর সমীপবর্তী হইয়াছিল হস্তী কেমন তাহা জানিবার জন্য। যে অন্ধ হাতীর কানটা স্পর্শ করিল সে ভাবিল হাতী বুঝি কুলার মতো। যে শুণ্ড স্পর্শ করিল সে চীৎকার করিয়া উঠিল, হাতী প্রকাণ্ড সাপের মতো। তৃতীয় অন্ধ হাতীর একটি পায়ে হাত দিয়াছিল, সে বলিল—আরে না, না, হাতী থামের মতো। যাঁহারা হাতীকে সমগ্রভাবে দেখিতে পান তাঁহারা জানেন হাতি সত্যই কি। তেমনি যাঁগারা সাহিত্যরসিক তাঁহারা জানেন প্রেমচন্দজী কি। তিনি দেশকালপাত্র দ্বারা আবদ্ধ নহেন, তিনি কোনও বিশেষ ভাষাভাষীর সম্পত্তি নহেন, আমরণ দুরূহ তপস্যা দ্বারা যে লোকে তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা স্বর্গলোক অপেক্ষাও গরীয়ান, তাহা প্রেম-লোক। ধনপৎ রায় বা নবাব রায় তাই আজ প্রেমচন্দে রূপান্তরিত, তাঁহার আসন আজ যে কোনও সিংহাসন হইতে মহত্তর কারণ তাহা কবির আসন। আমাদের দেশে কবির বড় সম্মান, এদেশে স্বয়ং ভগবানও কবির আসন পাইবার জন্য আগ্রহশীল।

প্রেমচন্দজীর পুণ্য মৃত্যু-তিথিতে আজ তাই আমার একান্ত অনুরোধ তাঁহার মহিমাকে আমরা যেন খণ্ডিত করিয়া না দেখি— তাঁহার সমগ্র সম্পূর্ণতার মধ্যেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস যেন আমরা করি।

কিন্তু একটা খট্‌কা লাগিল।

'মৃত্যু-তিথি' শব্দটি লিখিয়াই আমার মনে প্রশ্ন জাগিল—সত্যই কি প্রেমচন্দের মৃত্যু হইয়াছে? এই স্বাধীন ভারতে কি তিনি

বাঁচিয়া নাই? স্মারক-স্মৃতি-স্তম্ভের প্রাণহীন পাষাণ স্তূপে কি তাঁহার বাণীর অজস্র ধারা শেষ হইয়া গেল?

ঠিক এই সময়ে দ্বারে কে যেন করাঘাত করিল।

"ভিতরে আসতে পারি কি?"

"আসুন—"

দ্বার ঠেলিয়া এক সৌম্য গৌরবর্ণ পুরুষ প্রবেশ করিলেন। মুখের উপর এক জোড়া পৌরুষ-ব্যঞ্জক ঘন-গুম্ফ, চক্ষুর দৃষ্টি হাস্য-প্রদীপ্ত।

"নমস্কার—"

"নমস্কার। আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।"

"আমি প্রেমচন্দ।"

বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলাম। তাহার পর সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম।

প্রেমচন্দজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা তাহলে ঠিকই ক'রে ফেলেছেন যে, আমি মরে গেছি?...আপনার তো অন্তত জানা উচিত যে আমি মরি নি।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া—"আমি মরিনি, বরং আমি আরও প্রসারিত হ'তে চাই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ভাষার কারাগারে আমি বন্দী হয়ে গেছি। ভারতের প্রতি পুরুষ নারী বালক বৃদ্ধ যুবার অন্তরে আমি প্রবেশ করতে চাই, শুধু ভারতেই-বা কেন বিশ্বের প্রতিটি লোকের হৃদয় স্পর্শ করতে চাই আমি। কিন্তু পারছি না, বন্দী হয়ে আছি। আপনি কি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারেন?"

নিজের চক্ষু কর্ণকে আমি যেন ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। নির্বাক হইয়া রহিলাম।

কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া প্রেমচন্দজী বলিলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না? সত্যিই আমি প্রেমচন্দ। এই দেখুন, যাদের

আমি ভালবাসতাম তাদের আজও আমি বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি—”

শ্রীরামভক্ত মহাবীরজী একদা যেমন বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে রামসীতার যুগল মূর্তি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে প্রেমচন্দজী তেমনি তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেখাইলেন, সবিস্ময়ে দেখিলাম—এক বিরাট জীবন্ত জগত—গ্রাম্য কৃষক, মজুর পাশী, তামাক-ওলা, একা ওলা, ধূর্ত বণিক, সুদখোর ধনী, শোষক জমিদার, দোকানদার, পাণ্ডা, পুঁজিপতি, নববধূ, গ্রাম্য কিশোরী, বৃদ্ধা, সতী-অসতী—সব। ইহাদেরই মধ্যে দেখিলাম হোরি, গোবর, ঝুনিয়া, পুনিয়া, রায় সাহেব, মালতী, খন্না, ঘিসু, মাধো, বুধিয়া হলকু, সুরদাস, নির্মলা, তোতারাম, মনসা-রাম, প্রেমশঙ্করবাবু—এমন কি টমি এবং জাবরাও। সকলেই নিজ নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত—

যেই আমি প্রেমচন্দজিকে কিছু বলিতে যাইব অমনি তিনি অন্তর্ধান করিলেন। আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তাহার পর প্রণাম করিয়া বলিলাম, ”হে কালজয়ী অমর, আমারই ভুল, তোমার মৃত্যু হয় নাই, তুমি মৃত্যুঞ্জয়।”

বারাণসীতে নাগরী প্রচারিণী সভায় প্রেমচন্দের স্মারক-সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আসামে বাঙালীদের উপর যে অবর্ণনীয় অকথ্য বীভৎস অত্যাচার হয়েছে তাতে আমরা সকলেই সন্ত্রস্ত হয়েছি, আমাদের সকলেরই মনে সন্দেহ জেগেছে এই স্বাধীন ভারতে আমরা আর ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে পারব কিনা। আসামের বাঙালীদের প্রতি অনেকে অনেক রকম উপদেশ বর্ষণ করছেন। অনেক কুম্ভীরের চোখ দিয়েই অশ্রু ঝরছে দেখতে পাচ্ছি। ভুয়ো অহিংসা এবং মেকি প্রেমের মন্ত্রও আওড়াচ্ছেন অনেকে। হঠাৎ চমকে উঠলাম এক বাঙালী লেখকের লেখা পড়ে। তিনি লিখেছেন এর জন্যে বাঙালীরাই না কি দায়ী! বাঙালীদের অনেক দোষ কীর্তন করে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন যে, বাঙালীরা নাকি, কলহ-পরায়ণ, স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর বলেই এই উচিত শাস্তি পেয়েছে। তিনি বলেছেন যে, বাঙালীদের স্বাজাত্যবোধ বড় বেশী উগ্র, তারা আত্মম্ভরী, তাদের উচ্চম্মন্যতা (Superiority Complex) আকাশ-চুম্বী, তারা আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে না। সুতরাং যা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের ঔদাসীন্যে তিনি ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ তো হনই নি. তার সমর্থনই করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন সব প্রদেশ থেকে বাঙালীরাই কেবল বিতাড়িত হচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই তাদের দোষ।

তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে। বাঙালীদের যে সব দোষ তাঁর চোখে পড়েছে সে সব দোষ কি অন্য প্রদেশবাসীর নেই? স্বাজাত্যবোধ কি দোষের? আমরা বাঙালী বলে যদি গর্ব অনুভব না করতে পারি ভারতবাসী বলেই বা তাহলে গর্ব অনুভব করব কোন যুক্তি অনুসারে? পৃথিবীর কোন্ সভ্য-দেশবাসী এ দোষে

দুষ্ট নয়? আমাদের প্রধানমন্ত্রী কি আত্মম্ভরী নন? তিনি কি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে এমন সব কাণ্ড করে' বসেন না যা অনেক সময় শোভনতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে যায়? তা সত্ত্বেও তাঁকে আমরা ভালবাসি এবং সম্মান করি কেন? বাঙ্গালীর উচ্চম্মন্যতা কি ভুয়ো জিনিস? তার গর্ব করবার মতো কিছুই কি নেই? যদি থাকে তাহলে তা নিয়ে সে গর্ব করবে না কেন? সবাই তো করে। গর্ব করবার শিক্ষাই তো আমরা পেয়েছি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কাছ থেকে। কে না নিজের ঢাক নিজে পেটাচ্ছে? সরকারী আত্মপ্রচার কি তাঁর চোখে পড়ে নি বা কানে ঢোকেনি? জীব-বিজ্ঞানীরা বলেন, সংসারে বেঁচে থাকতে হলে নিজেকে জাহির করতেই হবে। যে কারণে সিংহ গর্জন করে, সাপ ফণা তোলে ময়ূর পেখম মেলে, পাপিয়া গান গায় ঠিক সেই কারণেই মানুষও আত্ম-প্রচার করে। তার এ প্রচার বহুমুখী। এটা পশু-নীতি সন্দেহ নেই, কিন্তু সংসারে থাকতে হলে ও নীতি অবলম্বন করতেই হয়। সবাই করে, এর জন্য শুধু বাঙালীকেই দোষী করা কেন?

সব প্রদেশ থেকে শুধু বাঙালীদেরই বিতাড়ন করা হচ্ছে কেন এর কারণ লেখক মশাইয়ের কাছে এখনও অস্পষ্ট আছে দেখে বিস্মিত হলাম। আশা করেছিলাম স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসটা তাঁর জানা আছে। তিনি কি জানেন না ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজদের একমাত্র শত্রু ছিল বাঙালী? বাংলা দেশেই স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, বাঙালী ছেলেমেয়েরা দেশের জন্য দলে দলে প্রাণ বিসর্জন করেছিল। ইংরেজ এ শত্রুতার শোধও নিয়েছেন ভীষণভাবে। অগ্নি-মন্ত্রের সাধকদের যে নির্যাতন তাঁরা করেছেন তা ভয়াবহ। সে ইতিহাস যদি পড়ে দেখেন শিউরে উঠবেন। সেই মার আমরা এখনও খাচ্ছি আমাদের স্বদেশ-বাসীরই হাত দিয়ে। কারণ প্রাদেশিকতার বীজ তাঁরাই বপন করে গিয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের বিষ তাঁরাই

ছড়িয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর দল ইংরেজদের শত্রু ছিলেন না, বন্ধু ছিলেন, তাদের সঙ্গে প্রেম-বন্ধনে বাঁধা পড়তে চেয়েছিলেন। তাই ওঁরা জেল খেটেছিলেন বটে, কিন্তু নির্যাতিত হননি। বরং জেলে বসে, ওঁরা যে কায়িক সুখ ভোগ করেছিলেন তা অনেকের পক্ষেই জেলের বাইরে দুর্লভ। পারিপার্শ্বিক ঘটনা-পরম্পরার চাপে ইংরেজ তাই যখন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হলেন তখন তাঁদের বন্ধুদেরই গদিতে বসিয়ে গেলেন আর বাঙালীকে ধ্বংস করবার জন্যে দেশটা ভাগ করে' দিয়ে গেলেন। তাঁরা যে প্রাদেশিকতার বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, এঁরা তার চারাকে তাই সমূলে উৎখাত না করে সার দিয়ে পুষ্ট করেছেন। সত্যিকার দেশ-প্রেমিক বাঙালীর সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক অনেক আগেই ছিন্ন হয়েছে। এখন যাঁরা গদিতে সমাসীন বাঙালীদের প্রতি তাঁদের মনোভাব ইংরেজদেরই মনোভাবের মতো। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভাষা ও সাহিত্যকেও তাঁরা বাঙালীদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান। বাংলার বাইরে কোথাও তার স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেন না, কারণ করলে নিজেরাই পৃথিবীর চক্ষে হেয় হয়ে যাবেন। কিন্তু সাধারণ বাঙালীর প্রতি তাঁদের আচরণ বিদ্বেষভাবাপন্ন। লেখক মশাইকে অনুরোধ করছি—বাঙালীদের সম্বন্ধে তিনি সশ্রদ্ধ হোন। 'আমরা বাঙালী' এ গর্ববোধ যদি আমাদের না থাকে, তাহলে আমরা অপর প্রদেশবাসীর ন্যায্য স্বাজাত্যবোধকেও সম্যক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারব না। আমরা ভারতবাসী এ আস্ফালনও শূন্যগর্ভ বলে মনে হবে। আমাদেব বৈশিষ্ট্য, আমাদের উত্তরাধিকার, আমাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে যদি আমরা সচেতন না থাকি, তাহলে আমরা বানের জলে পচা খড়ের মতো ভেসে বেড়াব, জীবন্ত বনস্পতির মর্যাদা কখনও পাব না।

এই, প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ বহুকাল আগে যা বলেছিলেন, তা উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"প্রেম বিস্তারের একটা বিহিত পদ্ধতি আছে। আগে প্রেম পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম স্বদেশে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা বিদেশে বিস্তৃত হয়। অগ্নির ন্যায় প্রেমের স্বভাবই প্রসারিত হওয়া। আপনার দেশের প্রতি তোমার প্রেম যথোচিত পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই যদি তাহা চকিতের মধ্যে সাত সমুদ্র পারে উত্তীর্ণ হইয়া আসর জমাইয়া বসে তবে সে প্রেমের ভিতর কোনও পদার্থ নাই—কোন রসকস নাই—তাহা অন্তঃসারশূন্য অলীক আড়ম্বর মাত্র। এ সকল ইঁচড়ে-পাকা প্রেম, হাঁটিতে শিখিবার পূর্বেই দৌড়িতে ও লম্ফ দিতে আরম্ভ করে। আপনার মা-বাপের পরিচয় পাইতে না পাইতেই অপর লোককে মা-বাপ বলিতে শেখে। এইরূপ ভূতগত প্রেমকে কেহ কেহ বলেন, সার্বভৌমিক উদারতা, কেহ বলেন, বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা, আমরা বলি, গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি···"।

বাংলার বাহিরে বাঙালীর শিক্ষা-সমস্যা

কিছুদিন পূর্বে যখন বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির আন্দোলন হয়েছিল তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এ বিষয়ে বাঙালী লেখকদের সম্মতি সংগ্রহ করেছিলেন। অনেক লেখক সম্মতি দিয়েছিলেন, আমিও দিয়েছিলাম। আমি দিয়েছিলাম কিন্তু একটি শর্তে। আমার সম্মতির কথাটা কাগজে বেরিয়েছিল কিন্তু শর্তের কথাটা বেরোয়নি। আমার শর্ত ছিল—সংযুক্ত বঙ্গ-বিহারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভার সম্পূর্ণরূপে বাঙালীদের হাতে থাকবে। ডাক্তার রায় খবরের কাগজের মারফত এ আশ্বাস পূর্বেই দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম এ আশ্বাস শুধু কাগজে নিবদ্ধ থাকলেই চলবে না, কাজে করতে হবে। বাঙালী ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষার ভার বাঙালীদের হাতেই ন্যস্ত করতে হবে। এ ঘটনার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে মেদিনীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিচত্বারিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতিরূপে আমি বলেছিলাম—"আমরা তিন পুরুষ বিহারে বাস করছি। আমার জন্ম বিহারে, বিহারী সমাজে এবং বিহারী পরিবেশেই আমি মানুষ হয়েছি, তাদের মধ্যে থেকেই আমি সাহিত্য-চর্চা করেছি, অন্নসংস্থানও করছি। তাদের আমি ভালবাসি, তাদের মহত্ত্বে ও সহৃদয়তায় আমি বিশ্বাস করি। বিহারী জনসাধারণও বাঙালীদের মতোই গুণগ্রাহী এবং সাহিত্যরসিক। কিন্তু ভয় করি আমি রাজনৈতিক নেতাদের। তাঁরাই যত গণ্ডগোলের মূল। বিহার-বাংলার একীকরণ শুভ ফলপ্রসূ হবে বলেই মনে হয় যদি তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবার সুযোগ থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁর বিবৃতিতে দেশ-

বাসীকে জানিয়েছেন যে, সে সুযোগ থাকবে, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের নিরাপত্তার জন্যে সংবিধানে তাঁরা রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রাখবেন। এইখানেই আমার একটু ভয় আছে। সংবিধানে রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা থাকলেই তা যে বর্ণে বর্ণে পালিত হবে এ প্রত্যয় অন্তত বিহারবাসী বাঙালীদের নেই। এখনই সংবিধানে সংখ্যা-লঘু-সম্প্রদায়ের জন্য যে সব উদার আইন আছে সে সব যদি ঠিকভাবে অনুসৃত হতো তাহলে বিহারবাসী বাঙালীদের মন এত বিষিয়ে উঠত না। বিহারে হিন্দী ভাষা প্রচার ও প্রসারের জন্য যে খরচ বিহার গভর্ণমেণ্ট করছেন, শুধু বিহারেই বা কেন, সমস্ত ভারতে হিন্দী ভাষা প্রচার করবার জন্য যে খরচ ভারত গভর্ণমেণ্টও করছেন অন্য ভাষায় জন্য তার সিকির সিকিও করেন নি। যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয়, হিন্দী ভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছে। আর্থিক এবং রাজনৈতিক চেষ্টা তো হয়েছেই, শারীরিক বলপ্রয়োগ করাও হয়েছে এমন সংবাদও খবরের কাগজে পড়েছি। বিহারে বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া করবার সুযোগ খুব কম বিদ্যালয়ে আছে, যেসব বিদ্যালয়ে আছে সেগুলি শাসক-সম্প্রদায়ের কৃপাদৃষ্টি-বঞ্চিত। যে সব বিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হয় সেখানকার পাঠ্যপুস্তকগুলি বাংলা হরফে মুদ্রিত বটে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মর্যাদার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রন্থকর্তারা প্রায়ই অবাঙালী। বিহার এবং উত্তর প্রদেশের অনেক কলেজেই বাংলা পড়াবার অধ্যাপক নেই। হাজারিবাগ কলেজে শুনেছি প্রায় শতকরা ৫ জন মুসলমান ছাত্রের জন্য দু'জন উর্দুর প্রফেসার আছেন কিন্তু প্রায় শতকরা ২০ জন বাঙালী ছাত্রের জন্য একজনও বাংলার প্রফেসার নেই। বিহারের অনেক কলেজ সম্বন্ধেই একথা সত্য। ইংলণ্ডে জার্মানীতে বাংলা পড়াবার অধ্যাপক আছে, কিন্তু বাংলার প্রতিবেশী বিহারে নেই। ভাগল-পুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পূর্বে গভর্ণমেণ্টের কাছে কিছু কিছু

আর্থিক সাহায্য পেত, এখন তারা তার বদলে পায় কিছু হিন্দী বই। বাঙালী ছেলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেও যথোচিত সম্মান পায়নি এরকম একাধিক উদাহরণ আমার জানা আছে। যেখানে প্রতিযোগিতা দ্বারা যোগ্যতা নির্ণীত হয় সেখানে কিছু কিছু চাকরি বাঙালীরা পায়, কিম্বা যেখানে যোগ্য বিহারী দুর্লভ সেখানেও পায়, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে বাঙালীর ছেলের চাকরি পাওয়ার আশা নেই, এমন কি নিয়োগকর্তা যদি বাঙালীও হন তবু তিনি যোগ্য বাঙালীকে চাকরি দিতে ভয় পান। হিন্দী সর্বসম্মতিক্রমে এখনও রাষ্ট্র ভাষারূপে স্বীকৃত হয়নি, এ বিষয়ে প্রচুর মতভেদ এখনও আছে, কিন্তু বিহারী নেতারা তাঁদের ভাষণে বলতে কসুর করছেন না যে, হিন্দীই ভারতের জাতীয় ভাষা, National language। সংবিধানে ১৪টি ভাষা National language রূপে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বাকি তেরোটিকে কোণঠাসা করবার প্রয়াসের অভাব নেই। তাছাড়া রাষ্ট্রভাষা আর National language যে এক জিনিস নয় তা ওঁরা মানতেই চাইছেন না। বাঙালী সাহিত্যিকদের বই বিহারী প্রকাশকরা বিনামূল্যে এবং বিনা অনুমতিতে ছেপে যাচ্ছেন। দেশের আইন নাকি ওঁদের পক্ষে। বিনা প্রতিবাদে ও প্রতিকারে এই সব অনাচার ও অত্যাচার বাংলা ভাষার উপর চলছে। এ নিয়ে যে সব সাহিত্যিক দিক-পালদের আন্দোলন করা উচিত, পুরস্কারের নামে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের বাৎসরিক কিছু টাকা দিয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ করেছেন। সাহিত্যিকরা এখন গভর্ণমেণ্টের ধামাধরাদের পর্যায়ে গিয়ে পড়ছেন। এই সব কারণে মনে হচ্ছে রক্ষা-কবচের কাগজী প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অনেকে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, তাঁদের ভয় হচ্ছে হিন্দী অটোক্র্যাসি মদমত্ত মাতঙ্গের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পদ্মবনকে বিদলিত করবে…”

সংযুক্ত বঙ্গ-বিহারে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এই দুর্গতি থেকে রক্ষা পাবে, ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে এই আশ্বাস পাবার পরই আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। বস্তুত, ওই শর্তেই সম্মতি দিয়েছিলাম।

বঙ্গ-বিহার সংযুক্ত হয়নি। বিহার-বাসী বাঙালীদের অবস্থা সুতরাং আরও শোচনীয় হয়ে আসছে। সম্প্রতি বিহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছেন অদূর ভবিষ্যতে (১৯৬০-এর পর থেকে) বিহারের বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা আর মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভও করতে পারবে না, পরীক্ষাও দিতে পারবে না। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে তারা ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত মাতৃভাষায় পড়াশোনা করতে পারে বটে, কিন্তু তার পরই যদি তাদের হিন্দী পড়তে বাধ্য করা হয় তাহলে তাদের যে কতটা অসুবিধা হবে তা সহজেই অনুমেয়। এর ফলে তারা ম্যাট্রিকুলেশনেও আর বাংলা পড়বে না, হিন্দীই পড়বে। অর্থাৎ বাঙালী ছেলে-মেয়েদের বাংলা-ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করতে হবে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যই বাঙালীর একমাত্র সম্পদ। এর থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের আর একটা অসুবিধা তাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি অতিশয় নিম্ন শ্রেণীর। বাংলাভাষার মর্যাদার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, হরফগুলো শুধু বাংলা, তা-ও ছাপার ভুলে কণ্টকিত। দ্বিতীয়তঃ এই বইও সময়মতো ছাপা হয় না এবং বাজারে পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলে-মেয়েদের বাধ্য হয়ে হিন্দী বইই কিনতে হয়। অ-হিন্দীভাষী ছেলে-মেয়েদের হিন্দী শেখাবার এও কি একটা কৌশল না কি!

এখন এর প্রতিকার কি?

এ বিষয়ে আমর যা মনে হয়েছে, বলছি :—

(১) দেশব্যাপী আন্দোলন করে' বিহারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রভাবিত করা,—যাতে তাঁরা আমাদের মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে

পড়াশোনা করবার ব্যবস্থা করেন এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি যাতে সুনির্বাচিত হয়ে ঠিক সময়ে বাজারে বেরোয় সেদিকে দৃষ্টি দেন।

(২) বিহার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যদি কিছুতেই প্রভাবিত করা সম্ভব না হয় তাহলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই অসহায় ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নিতে বলা উচিত। এটা তাঁরা দু'রকম উপায়ে করতে পারেন। (ক) বাংলার বাইরের কোন শিক্ষালয় (কলেজ বা স্কুল) যদি বাঙালী-প্রধান হয় এবং তারা যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তাহলে তাদের সে সুযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের দেশেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ, জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পড়া হয়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পরীক্ষা নেন, সার্টিফিকেট দেন। এতে কোন বাধা হয় না। ভারতবর্ষে বসে যদি কেম্ব্রিজের পরীক্ষা দেওয়া চলতে পারে বিহারে বসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া কেন চলবে না তা তো সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। এর বিরোধী যদি কোন আইন থাকে তাহলে সে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিত। আমার তো মনে হয় এই সব বাংলাভাষী স্কুল কলেজগুলিকে পশ্চিম বাংলা গভর্ণমেন্টের অর্থ সাহায্যও করা উচিত শিক্ষা দপ্তর থেকে। বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য তাঁরা অনেক খরচ করেন শুনেছি, এটাও তার অঙ্গ হওয়া উচিত। তাঁদের মনে রাখা উচিত বাঙালীর শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলার বাইরের বাঙালীর দানও কম নয়। (খ) কোনও বাঙালী ছাত্র বা ছাত্রী যদি বাড়ীতে বসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে চায় তাহলে তাদের সে সুযোগ দেওয়া উচিত। এ সুযোগ আছে শুনেছি, কিন্তু কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। মুশকিল হয় বিজ্ঞান পড়া-শোনায়। তার জন্যে ল্যাবরেটরি অপরিহার্য। কিন্তু তারও একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হতে পারে কর্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হন। আমরা বিহার-বাসী

বাঙালীরা ঘটনাচক্রে বিহার নামক ভূখণ্ডে বাস করি বলে এবং রাজনৈতিক দাবা খেলায় বিহার গভর্ণমেন্টের শাসনাধীনে আছি বলে আমাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সব বিসর্জন দিতে হবে? বাংলাদেশও কি আমাদের পর করে দিতে চান? এক রাজনৈতিক দাবাখেলায় আমরা বাংলাদেশের অর্ধেককে পূর্ব পাকিস্তান করে পর করে দিয়েছি, আর এক চালে ঐতিহাসিক বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি, (যথা পূর্ণিয়া, সিংভূম প্রভৃতি) মূল বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পর হতে বসেছে। বিহারের বিশ্ববিদ্যালয়রা তাদের বাংলায় পড়াশুনা পর্যন্ত করতে দিতে নারাজ। খাস কলকাতা সহরেই শুনছি অবাঙালীরাই এক সাহিত্য ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে হর্তাকর্তা বিধাতা। সাহিত্য ক্ষেত্রেও অবাঙালীরা আমাদের বানচাল করে দেবার নানা উপায় অবলম্বন করছে, নেপথ্যে এবং প্রকাশ্যে। যে স্বাধীনতার জন্যে বাঙালী একদিন সর্বস্ব পণ করেছিল সে স্বাধীনতা পেয়ে তার কি লাভ হয়েছে? অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, চাকরি নেই। শেষে কি তার মাতৃভাষাটাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে? ট্যাক্সভারে জর্জরিত হয়ে শুধু কি আমরা কতকগুলো চোর-জুয়াচোর সৃষ্টি করবারই সাহায্য করে যাব?

বাংলার বাইরে বাঙালীদের এই মহতী বিনষ্টির বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা-ভাষাভাষীদেরই বদ্ধপরিকর হতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের বাঙালীদের। বিহারবাসী বাঙালীরা বিহারীদের অন্ন-দাস হয়ে পড়েছে, তাদের বুক ফেটে গেলেও মুখ খোলবার উপায় নেই, সাহস নেই।

বাংলাদেশের সব নেতারা যত্রতত্র বক্তৃতা করছেন যে, ভারতের ঐক্য, ভারতের সংহতি যেন নষ্ট না হয়। কিন্তু যে সব ছোট ছোট কাঁটা এই কাল্পনিক ঐক্য-বেলুনকে ক্ষত-বিক্ষত করছে সে সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন। ভাষা সমস্যার যদি সন্তোষজনক সমাধান

তাঁরা না করতে পারেন, তাহলে এই ঐক্য হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। নিজের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি কেউ বিসর্জন দিতে রাজি হবে না।

বাঙালী জাতির শুভানুধ্যায়ী যাঁরা, তাঁদের দৃষ্টি আমি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আজ ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম-বার্ষিকীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ইহা আমি জানি, সভায় এইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে একটা শস্তা নাটকীয়তা আছে, ইহাও সুবিদিত যে নীরবে শ্রদ্ধা নিবেদন করাই শ্রদ্ধা নিবেদনের শোভন ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। কিন্তু তবু আমরা এই সভার আয়োজন করিয়াছি, প্রতিবৎসরই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়, ইহার কারণ সরবে শ্রদ্ধা নিবেদন না করিলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে এই নিয়মই প্রচলিত।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

বেদগুলি ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতি গুলিও তাই। মুনিদের মধ্যেই প্রবল মত ভেদ, ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন তাহাই পথ।

মহাজনদের পথ অনুসরণ করিয়া তাই আজ আমরা ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বলিতেছি—হে কীর্ত্তিমান, আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ কর। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ঋষি কবি শ্রদ্ধাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মাধ্যন্দিনং পরি
শ্রদ্ধাং সূর্য্যস্য নিরুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ মাম্।

হে শ্রদ্ধা তোমাকে আমরা প্রাতে, মধ্যদিনে এবং সূর্যাস্তকালে পূজা করি। হে শ্রদ্ধা, তুমি আমাকে শ্রদ্ধাবান কর।

তাঁহারই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও আজ বলি—হে শ্রদ্ধেয়, তোমাকে আমরা প্রাতে, মধ্যদিনে এবং সূর্যাস্তকালে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। হে গুণি, তোমার আদর্শ আমাদিগকে মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান করুক।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আপনাদের প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তন কর্ম্মী ও হিতৈষী—স্বর্গীয় ডাক্তার অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথের জীবন-কথায় লিখিয়াছেন "ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ভারতবর্ষে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি—জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহার প্রভাব সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। পাশ্চাত্যের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও জড়বাদ এবং প্রাচ্যের এক মহত্তম জীবনবোধ ও অধ্যাত্মবাদের সংঘাতে নূতন এক শ্রেয়োবোধের বিকাশ তখনকার তরুণদের মনকে অধিকার করিয়া লইল……অতি তরুণ বয়সে যখন নরেন্দ্রনাথ কুমিল্লার ছাত্র তখন হইতেই এই নবজাগরণের ডাক তাঁহার প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছিল। 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' দলের বিপ্লবী চেতনা তাঁহার তরুণ প্রাণকে প্রভাবিত করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ যখন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়িতেন তখন এই পথের কর্ম্মী ছিলেন ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমূল্য উকিল, বাঘা যতীন, ডাঃ দাশগুপ্ত—ইঁহাদের সঙ্গে রাজনৈতিক অভিমত এবং পন্থা বিষয়ে প্রায়ই তাঁহার আলাপ আলোচনা হইত সঙ্গোপনে, কিন্তু তিনি অগ্রণী হইয়া সক্রিয়ভাবে ইহাদের কাজে অংশ গ্রহণ করেন নাই।"

এই যুগের অধিকাংশ স্বদেশপ্রাণ কর্ম্মীই হয় প্রত্যক্ষভাবে না হয় পরোক্ষভাবে 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। যদিও

তিনি সক্রিয়ভাবে ইঁহাদের কাজে অংশ গ্রহণ করেন নাই কিন্তু এই আদর্শের মহান প্রভাব তাঁহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'—এই ছিল সে আদর্শ। মন্ত্রের সাধন করিতে হইলে যে তপস্যা প্রয়োজন বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্র নাথ সেই তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সে তপস্যার মূল লক্ষ্য আত্মোৎকর্ষ। এই আত্মোৎকর্ষই কর্ম্মযোগীর প্রধান অবলম্বন। নরেন্দ্রনাথ সত্যই একজন কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে যে আত্মসম্মানের ভিত্তির উপর না দাঁড়াইতে পারিলে আত্মোৎকর্ষ সম্ভব হয় না সেই আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তিনি কি কৃচ্ছ্র-সাধনই না করিয়াছেন। শৈশব হইতেই তিনি উপার্জ্জন করিয়াছেন, মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় রাত্রে খিদিরপুর ডকে কুলির কাজ করিয়া নিজের খরচ নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তবুও অর্থের জন্য কাহারও নিকট হাত পাতেন নাই, এমন কি নিজের পিতার নিকটও নয়। তাঁহার এই অটল আত্মসম্মান তাঁহার প্রকৃত স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। নিজের প্রয়োজনের জন্য কাহারও নিকট প্রার্থী হইব না, কাহারও নিকট মাথা নত করিব না, নিজের যাহা প্রয়োজন তাহা সসম্মানে নিজের শক্তিতেই অর্জ্জন করিব—এই নীতিই তাঁহাকে আমরণ চালিত করিয়াছে। এই অনড় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে, অনলস কর্ম্মী হইতে হইবে এবং সে কর্ম্মের লক্ষ্য হইবে দেশের ও দশের হিত-সাধন। নিজের স্বার্থের জন্য পশুরাও কর্ম করে, কিন্তু মানুষের কর্ম্মের লক্ষ্য পরার্থ, কর্ম্মী উপলক্ষ মাত্র।

এই যে শিক্ষা, আদর্শের পথে নির্ভীক পদক্ষেপ করিবার এই যে উৎসাহ ইহার উৎস কোথায়? আমার বিশ্বাস ইহার উৎস সে যুগের অনুশীলন সমিতি, সে যুগের শিক্ষকদের আন্তরিক প্রয়াস এবং আদর্শ চরিত্র।

আর একটা প্রবল উৎসও ছিল। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মের প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে আর এক নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি উত্তর কালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্ববিখ্যাত হন। আমার মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবও ক্যাপ্টেন দত্তকে কম উদ্বুদ্ধ করে নাই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'কর্ম্মযোগ' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন ক্যাপ্টেন দত্তের জীবনে ও কর্ম্মে তাহা যেন প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

ক্যাপ্টেন দত্তের বাল্য ও কৈশোর জীবনে এমন কি তাঁহার যৌবনের প্রারম্ভেও তাঁহাকে দারিদ্র্য ও দুঃখের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। স্বামীজি তাঁহার কর্ম্মযোগ প্রবন্ধে গোড়াতেই বলিয়াছেন—

"In studying the great characters the world has produced, I dare say, in the vast majority of cases, it would be found that it was misery that taught more than happiness, it was poverty that taught more than wealth, it was blows that brought out their inner fire more than praise.

ইহার ভাবার্থঃ—পৃথিবীর মহৎ চরিত্র গুলি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে সুখ নয়, দুঃখই তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষক, আর্থিক সাচ্ছন্দ্য নয় কঠোর দারিদ্র্যই তাঁহাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক। প্রশংসায় নয় কঠোর আঘাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল তাঁহাদের অন্তরের অগ্নি, তাঁহাদের উজ্জ্বল চরিত্রমহিমা।

ক্যাপ্টেন দত্ত একজন আদর্শ কর্ম্মী ছিলেন। এই কর্ম্মের আদর্শকে তিনি কল্পনাতেই নিবদ্ধ রাখেন নাই, বাস্তবেও মূর্ত করিয়াছিলেন।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।

গীতার এই মহাবাণীর অর্থ—যে মূঢ় ব্যক্তি হস্ত, পদ, বাক্য প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক অবস্থান করে তাহাকে মিথ্যাচারী বলে।

ক্যাপ্টেন দত্ত কখনও নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকেন নাই, পঞ্চেন্দ্রিয়কে সার্থক ভাবে নিযুক্ত করিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা আজ সুবিদিত। আলস্যজনিত মিথ্যাচারের প্রতিবাদ তিনি তাঁহার সারাজীবন দিয়া করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজির 'কর্ম্মযোগ' প্রবন্ধের একস্থানে আছে :—

"Even the lowest forms of work are not to be despised, let the man who knows no better, work for selfish ends, for name and fame; but every-one should always try to get towards higher and higher motives and to understand them."

ইহার ভাবার্থ :—হীনতম কাজকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। যাহাদের উচ্চাদর্শ নাই তাহারা নাম এবং যশের জন্যই কার্য্যে প্রবৃত্ত হোক। কিন্তু প্রত্যেকেরই উচিত কর্ম্মযোগের উচ্চাদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখা। এই উচ্চাদর্শের কথা গীতায় আছে "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন।"

ক্যাপ্টেন দত্তের জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে যদিও তিনি প্রথম জীবনে স্বার্থ, নাম ও যশের জন্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু ক্রমশ কর্ম্মযোগের উচ্চাদর্শ-মহিমা তাঁহার কর্ম্মজীবনকে আলোকিত এবং কর্ম্মপথকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। তাহা যদি না করিত তাহা হইলে তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সার্ভিসের সুখময় পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে মরণোন্মুখ বেঙ্গল ইমিউনিটির দুর্ব্বহ ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতেন না।

দুঃখকে এবং বিপদকে তিনি কখনও ভয় করেন নাই।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর কবিতার বাণী

আরও, আরও, প্রভু আরও আরও
এমনি করে আমায় মারো, মারো।

কিম্বা

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে যেন করিতে পারি জয়

তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছিল, বিপদকে বা দুঃখকে তিনি ভয় করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন বিপদ বা দুঃখ যতই নিদারুণ হোক না কেন তিনি চরিত্র বলে তাহা উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।

স্বামীজির 'কর্ম্মযোগ' প্রবন্ধে আছে—"to advance we must have faith in ourselves first and then in God. He who has no faith in himself can never have faith in God."

জীবনে উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে আত্মবিশ্বাস চাই, তাহার পর ঈশ্বরে বিশ্বাস। যাহার আত্মবিশ্বাস নাই তাহার জীবনে ভগবৎ বিশ্বাসও আসিতে পারে না।

এই আত্মবিশ্বাস নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। They can conquer who believe they can, মহাকবি ভার্জিলের এই উক্তির যাথার্থ্য নরেন্দ্রনাথের জীবনে আমরা প্রমাণিত হইতে দেখিয়াছি। এই আত্মবিশ্বাসের বলেই শত প্রতিকূলতার মধ্যে নানা সঙ্কটের জটিলতা ভেদ করিয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে জয়ী হইয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা, কর্ম্মী নির্ব্বাচনে তাঁহার দূরদৃষ্টি, তাঁহার প্রবল আত্মসম্মানবোধ, বিরাট আদর্শের প্রতি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল বলিয়াই তিনি বেঙ্গল-ইমিউনিটির মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে রূপ দিতে পারিয়াছেন।

তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আজ আমি ধন্য হইলাম।

বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে নরেন্দ্রনাথের মতো কর্ম্মবীরের জীবনী আলোচনা করার প্রয়োজন। বাংলার যে সব সুসন্তান একদিন শুধু বাংলার নয় সমস্ত ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া নিজেদের জগৎ-সুধী-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর লোক। তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিলে জানিতে পারি তাঁহারা কেবল যে প্রতিভাবান ছিলেন তাহা নয় তাঁহারা চরিত্রবানও ছিলেন। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথও এই যুগান্তকারী অগ্রণীদের একজন। হয়তো সৃষ্টিধর্ম্মী প্রতিভায় ইনি অনেকের সমকক্ষ ছিলেন না কিন্তু চারিত্রিক বলে যে ছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলেই জানিতে পারি। প্রতিভা ভগবানের দান কিন্তু চরিত্র মানুষ নিজে অর্জ্জন করে। তাই প্রতিভাবান অপেক্ষা চরিত্রবান আমাদের দেশে বেশী পূজনীয়। কিন্তু এরূপ পুজনীয় ব্যক্তি আমাদের দেশে আজ কয়জন আছেন? বাঙ্গালীর আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, কর্ম্ম নাই, কর্ম্ম প্রেরণাও নাই! তাহার দেশ আজ দ্বিখণ্ডিত, তাহার ন্যায্য প্রাপ্য আজ সে পায় না, তাহার ভাষা ও সাহিত্য আজ বিড়ম্বিত। তাহার কারণ তাহার চরিত্রের অভাব, তাহার মেরুদণ্ড নাই, সে সত্যকথা বলিতে ভয় পায়। অন্যায়কে অন্যায় বলিবার সাহস তাহার নাই। অন্যায়ের প্রতিকার করিবার শক্তি আজ সে হারাইয়াছে। তাহার বিজ্ঞানসভায় আজ অবিজ্ঞানীর ভীড়, তাহার সাহিত্য সভায় অসাহিত্যিকের প্রাধান্য। মিথ্যাচারপূর্ণ রাজনীতি লইয়াই সে আজ মাতিয়াছে, ভাবিয়াছে বুঝি এই প্রার্থনা-প্রধান রাজনীতিই তাহাকে ক্ষুধার অন্ন, আপিসের চাকরি এবং সামাজিক সর্ব্বপ্রকার সুবিধা আনিয়া দিবে। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে সৎচরিত্রজাত শক্তি না থাকিলে পৃথিবীতে অতি তুচ্ছ সাংসারিক সুখও মেলে না।

সুবিধাবাদী মতবলবাজরাই ক্ষীণশক্তি ক্ষীণকণ্ঠ দুর্ব্বলদের উপর অত্যাচার করিয়া নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করে। এখনও তাহাই হইতেছে। 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' এই মহামন্ত্র আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথমভাগ দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি প্রাথমিক গ্রন্থেও যে সকল মনুষ্যত্ব-দ্যোতক নীতিকথার বাণী শিখিয়াছিলাম তাহাও আর আমাদের মনে নাই। আমরা সত্য কথা বলিতে অপারগ, পরের দ্রব্যে আমাদের লোভের অন্ত নাই। পরশ্রীকাতরতা আমাদের মজ্জাগত হইয়াছে। আজ আমাদের দক্ষতা কেবল সিনেমা এবং সাহিত্যের নামে ন্যক্কারজনক কামনা উদ্গারে। উচ্চাদর্শের কথা এখন হাস্যকর। অন্য প্রদেশবাসীর সাহায্য না পাইলে আমাদের সংসার চলে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাও অচল হইয়া পড়ে। আমরা সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, আমাদের কে বাঁচাইবে? বাঁচাইতে পারে ক্যাপ্টেন দত্তের মতো মহজ্জীবনের আলোচনা যদি সে আলোচনা করিবার আমরা সময় পাই এবং সে আলোচনা অনুসারে কাজ করিবার উৎসাহ যদি আমাদের প্রাণে জাগে। বাঁচাইতে পারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী, যদি সে বাণী আমাদের প্রায়-বধির কর্ণে প্রবেশ করিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করে। এই কিছু দিন আগে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, একবার নয় বার বার বলিয়া গিয়াছেন—"বাইবেলে আছে—'You shall not eat except by the sweat of your brow'—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে পরিশ্রম করে, ভোগে অধিকার তারই আছে। যে অলস, যে পরভাগ্যোপজীবী তার বেঁচে থাকার অর্থই নেই। যে কেউ সৎপথে থেকে আপন পরিশ্রমে আপনি উপার্জ্জন করে সেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র—সে ছোটলোক নয়—ভদ্র-শ্রেষ্ঠ এইকথা আমাদের মনে রাখতেই হবে"।

আজ কর্ম্মবীর নরেন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকীতে উপস্থিত হইয়া

অন্তরের একটি কামনাই শেষে নিবেদন করিব—"দেশের আজ বড় দুর্দ্দিন। কোথায় তুমি সেই ভদ্রশ্রেষ্ঠ, নিজের মহিমায় দশদিক আলোকিত করিয়া আত্ম প্রকাশ কর। আমি কবি তোমাকে অভিনন্দন করিয়া ধন্য হই। আমি জানি তুমি আছ, কিন্তু ঘুমাইয়া আছ। জাগো, জাগো, জাগো।

তোমরা জাগিয়া ওঠ ভাই
আর তো সময় বেশী নাই।

দুর্গমের অভিসারে তুচ্ছ করি অন্ধকারে
উচ্চে তুলি শির
পণ করি মন-প্রাণ হবে যারা আগুয়ান
তোমরা কি নহ সেই বীর ?

মিথ্যাচারে দীনতায় ধূর্ত্ততার হীনতায়
আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা
পড়ে না কি তাহা চোখে আলস্যের স্বপ্নলোকে
হেরিতেছ কোন্ মরীচিকা ?

ভিক্ষাপাত্র করি সার করে যাবা হাহাকার
বিসর্জ্জিয়া সকল সম্মান
অত্যাচারী পদ লেহি করে যারা দেহি দেহি
তাহারা কি বাঙালী সন্তান ?

এদেরই বাঁচাবে বলে' প্রাণ দিল দলে দলে
একদা কি শহীদের দল ?

আসিল বিবেকানন্দ রবীন্দ্রের দিব্য ছন্দ
ফুটাইল বাণী শতদল ?
কই তারা কোথা তারা কোথা সে আদর্শধারা
কে করিবে নব উদ্বোধন ?

সবে বলে মরে' গেছে সে কুসুম ঝরে গেছে
কেন বৃথা অরণ্যে রোদন।
কিন্তু জানি বৃথা নয় হবে জয়, হবে জয়
ভস্মস্তূপে জাগিবে অঙ্কুর
আজ যাহা ছিন্ন-তন্ত্রী আসিলে নবীন যন্ত্রী
সে বীণাই গাবে নব সুর।

তোমরা জাগিয়া ওঠ ভাই
আর তো সময় বেশী নাই।

ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার ভাগ্যগগন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছে, ইংরেজ ও নবাবের দ্বৈতশাসন চক্রতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া বাংলাদেশ আর্তনাদ করিয়াছে, ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের অবাধ লোলুপতা, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের কবলে পড়িয়া বাংলা দেশের ওষ্ঠাগতপ্রাণ যে করুণ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। বিচারের নামে ব্রাহ্মণ নন্দকুমারকে হত্যা করা হইয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশের জীবনীশক্তি শোষণ করিয়া বাংলার নর-নারীকে পশুর স্তরে নামাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেখানে নামিয়াও তাহারা বাঁচে নাই। বঙ্কিম-চন্দ্রের আনন্দ-মঠে আমরা ইহার ভয়াবহ বর্ণনা পাই। তখন বাঙালী কল্পনাও করিতে পারে নাই যে তাহার তমসাচ্ছন্ন জীবনে আবার আলো দেখা দিবে। কিন্তু আলো দেখা দিয়াছিল। শুধু দেখা দেয় নাই, দিগ-দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া জ্যোতির যে প্লাবন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল তাহার তুলনা সম-সাময়িক ইতিহাসে আর দেখিতে পাই না। ঊনবিংশ-শতাব্দীতে বঙ্গদেশের অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া বহু জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ডাক্তার নীলরতন সরকার সেই জ্যোতিষ্ক-দের অন্যতম। তাঁহার জীবন-চরিতের বিশদ আলোচনা করিবার সুযোগ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। আমি তাঁহার জীবনী হইতে কিছু কিছু উপকরণ লইয়া কেবল দেখাইবার চেষ্টা করিব কি করিয়া পরিবেশের প্রভাব ও আনুকূল্য তাঁহার জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিল।

যখন তিনি তিন বৎসরের শিশু তখন ঝড়ে তাঁহার পৈতৃক আবাসভূমি বিধ্বস্ত হয় এবং তাঁহার পিতা-মাতা সপরিবারে

জয়নগরে নিজেদের তত্রস্থ গৃহে চলিয়া যান। জয়নগরে নীলরতনের মাতুলালয় ছিল এবং তাঁহার মাতুল অতি সহৃদয় ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। প্রায় বারো বৎসর মাতুল চরিত্রের শুভ-প্রভাব নীলরতনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। অনেকের মতে তাঁহার চরিত্রের বহুগুণেই তিনি মাতুলের মতই ছিলেন। তাঁহার ক্ষেত্রে নরাণাং মাতুলক্রমঃ এই বাক্যটি সার্থক হইয়াছিল।

এইখানে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। নীলরতনের মাতুল যদি তাঁহার চরিত্র-গঠনে সহায়তা না করিতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভা-অঙ্কুর কি শৈশবে এরূপ সুললিত হইত? জানিতে ইচ্ছা করে এখন আমাদের সমাজে কয়জন এমন সক্ষম সহৃদয় মাতুল আছেন যিনি বিপন্ন ঝঞ্ঝাহত আত্মীয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে ব্যগ্র। পথে নিত্য বহু অসহায় শিশু ও বালককে দেখি যাহাদের বন্ধু ও অভিভাবক কে বা কাহারা তাহা জানা যায় না। কে জানে তাহাদের মধ্যে কোনও নীলরতন আছে কি না।

নীলরতন মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন :—

As a boy he would spend hours reading the Ramayana and Mahabharata to her.

আজ জানিতে ইচ্ছা করে কয়জন বালক মাকে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনায়। আরও জানিতে ইচ্ছা করে আজ কয়জন মাতা ধৈর্যভরে পুত্রের রামায়ণ মহাভারত পাঠ শুনিতে প্রস্তুত। নীলরতনের মা দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করিয়া প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। তাঁহার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নীলরতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন এবং সারাজীবন রোগার্ত নরনারীর দুঃখলাঘবের চেষ্টা করিবেন।

আমাদের দেশে প্রত্যহ বহু মাতা অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যু-শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া

আজকাল কয়জন বালক এমন প্রতিজ্ঞা করেন? নীলরতন ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়িবার সময় এবং পড়িবার পরেও বহুকাল স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া তাঁহার দরিদ্র পরিজনদের অর্থসাহায্য করিতেন। তথাপি স্কুলে তাঁহার পরীক্ষার ফল এত ভালো হইয়াছিল যে কলেজের প্রিন্সিপাল এবং শিক্ষকগণ তাঁহার অধিকতর উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে উৎসাহবোধ করিয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজেও যখন তিনি ছাত্র তখনও তাঁহার মেধা ও কৃতিত্ব তাঁহার অধ্যাপকগণের আন্তরিক আশীর্বাদ ও সাহায্য লাভ করিয়াছিল। এখনও অনেক দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজে পড়িতে পড়িতে অভাবের তাড়নায় অন্যত্র চাকরী করিতেছে শুনিতে পাই। কিন্তু তাহারা কি আজকালকার অধ্যাপকদের সস্নেহ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে? আজকাল ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক তেমনি মধুর আছে কি? পূর্বে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক বড় মিষ্ট, বড় ঘনিষ্ঠ ছিল। এখন ক্রমশঃ তাহা যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। ছাত্র-শিক্ষকের ব্যবসায়িক সম্পর্কই আজকাল মুখ্য। আন্তরিক সম্পর্ক নিতান্তই গৌণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। অবস্থা এইরূপ চলিতে থাকিলে আমরা কি আর একটি নীলরতনকে পাইব?

কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্র তাঁহার খ্যাতি আলোর মতো চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার জীবনীকার ইহাকে 'phenomenal' আখ্যা দিয়াছেন। এই বিপুল সাফল্যের মূলে তাঁহার চিকিৎসা-শাস্ত্রনৈপুণ্য তো ছিলই, কিন্তু কেবলমাত্র তাহা থাকিলেই তিনি অত বড় হইতেন না। তিনি হৃদয়বান ছিলেন বলিয়াই অত বড় হইয়াছেন। তিনি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে জানিতেন, আকস্মিক বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা সঙ্কট পার হইবার কৌশলও তাঁহার জানা ছিল, প্রতিটি রোগীকে তিনি আন্তরিক যত্নসহকারে সেবার মনোভাব লইয়া পরীক্ষা করিতেন। গরীব রোগীদের নিকট পারিশ্রমিক লইতেন না, অনেক সময়

তাহাদিগকে বিনামূল্যে ঔষধপথ্যও দিতেন। তাঁহার নিকট উপকৃত রোগীর সংখ্যা অগণিত। তাঁহার জীবনীকার বলিতেছেন—"He received innumerable people known and unknown, rich or poor, friends and strangers from other provinces and countries with their families into his own home for treatment. It is known he had picked up sick persons from the street and brought them home."

আজকাল যে সব ডাক্তার আমাদের দেশে চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জন করেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন আছেন যাঁহারা একাধারে উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী? নীলরতন কেবলমাত্র ডাক্তার ছিলেন না। স্বদেশ-প্রেমিকও ছিলেন। যে প্রেরণা, যে উদ্দীপনা, যে মহতী নিষ্ঠা সেকালের সমস্ত শিক্ষিত বাঙালীকে দেশের সামগ্রিক মঙ্গল-কর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা অতি কর্মব্যস্ত চিকিৎসক নীলরতনের চিত্তেও সাড়া তুলিয়াছিল। আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কার, আমাদের চিকিৎসকগণের আত্ম-সম্মান রক্ষা, আমাদের পরমুখাপেক্ষী দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন করিয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা একজন কর্মব্যস্ত চিকিৎসকের পক্ষে বিস্ময়কর। আমাদের দেশে ডাক্তারী পড়িতে হইলে তখন গভর্ণমেণ্টের কলেজ স্কুলেরই শরণাপন্ন হইতে হইত। তিনিই এদেশে স্বাধীন স্কুল-কলেজ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল, কলেজ অব্ ফিজিসিয়ানস্ এণ্ড সার্জনস্ তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও উল্লেখযোগ্য। এই সব দুরূহ কর্মে তিনি সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন তাঁহার অনিন্দনীয় অপূর্ব চরিত্রবলে। তাঁহাকে আপামর ভদ্র সকলেই শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত। লর্ড কারমাইকেলও তাঁহার এই ব্যক্তিত্বের অপূর্বতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এই জন্যই

সম্ভবতঃ ওই স্কুল ও কলেজগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছিল। কলেজ অব ফিজিয়ানস্ এণ্ড সার্জন্‌সই পরে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয়। তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন, ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাব, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, যাদবপুর টিউবারকুলসিস হাসপাতাল—কোথায় না তিনি ছিলেন! নিজের বাড়ীতে ক্লিনিকাল ল্যাবরেটরি স্থাপন করিয়া তিনি তরুণ চিকিৎসকদের গবেষণা করিবার সুযোগ দিতেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গবেষণার জন্য Cardiogram আনিয়া তাঁহার শর্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক বিখ্যাত Cardiologist তাঁহার এই বাড়ীতেই কাজ শিখিতে শুরু করেন।

তিনি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করিতেন। তাই দেশের অন্যান্য শিক্ষার সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন থাকেন নাই। স্বদেশীযুগের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের সহিত নিজেকে তিনি যুক্ত করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্‌ষ্টিটিউটের সহিত.। এই ইন্‌ষ্টিটিউটই পরে যাদবপুরের কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেক্‌নলজি নামে বিখ্যাত হইয়া এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার মধুর স্বভাব এবং নিষ্কলুষ উদারতার জন্য দেশের অনেক বড়লোকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এই বন্ধুত্বকেও তিনি দেশের কাজে লাগাইয়াছিলেন। তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান মন্দিরে যে বিপুল অর্থ দান করিয়াছিলেন তাহা এই বন্ধুত্বের জন্য। তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন—The Rashbehari Ghosh endowment, the Khaira endowment and many others enriched the university as well as individual institutions, such as the Jadavpur T B. Hospital, through such friendships।.

তাহার জীবনী পড়িয়া মনে প্রশ্ন জাগে আধুনিককালে এমন বিদ্বান এমন হৃদয়বান এমন স্বদেশ- প্রেমিক দিকপালের দর্শন কি মেলে? যে সকল সদগুণের প্রভাবে তিনি দেশে আপামরভদ্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, ধনী দরিদ্রকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিয়াছিলেন এবং বাঁধিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই যিনি দেশের জন্য এত সৎকাজ করিয়া গিয়াছেন সে সব গুণাবলী আমাদের কয়জনের মধ্যে আছে?

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন, অনেক বৎসর ধরিয়া Dean of the Faculties of Medicine and Science ছিলেন। Post Graduate and Councils of Arts and Scienceএর President হইয়াছিলেন। Empire University Conferenceএ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া তিনি লণ্ডনে গমন করেন। সেখানে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে DCL এবং Edinburgh বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে LLD-উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি বিশ্বভারতীর একজন ট্রাষ্টি এবং প্রধান ছিলেন। বোস ইনষ্টিটিউটেরও ট্রাষ্টি এবং পরিচালক সমিতির সভ্য ছিলেন। ইহা ছাড়াও বহুকাল তাঁহাকে Indian Association for the Cultivation of Science নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে থাকিতে হইয়াছিল। Indian museumএর ট্রাষ্টিদের মধ্যেও তিনি একজন ছিলেন।

এই বিপুল ও বিচিত্র কর্মভারের মধ্যেও তাঁহার আদর্শবাদী মন ক্লান্ত হয় নাই। কি করিলে দেশের আর্থিক উন্নতি হইবে এ চিন্তাও তিনি করিয়াছিলেন। ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরি এবং ন্যাশনাল ট্যানারি এই চিন্তার ফল। যদিও এসব করিতে গিয়া তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত হন, কিন্তু এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্বের প্রমাণও জাতির ইতিহাসে লিখিয়া রাখিবার মতো।

নীলরতন ইহলোকে আর নাই। কিন্তু তাঁহার কীর্তি, তাঁহার

সম্বন্ধে অসংখ্য কাহিনী, তাঁহার দেবতাসুলভ স্বভাব, তাঁহার অমিত বীর্য এবং ধৈর্য আজ তাঁহাকে অমরত্বদান করিয়াছে। আমরা আজ ভক্তিবিনম্রচিত্তে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। সত্যই তিনি প্রণম্য, সত্যই তিনি শ্রদ্ধেয়। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে।

জীর্ণসন্নং প্রশংসীয়াদ্
ভার্যাঞ্চ গত যৌবনাম্
রণাংপ্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ
গৃহমাগতম্।

জীর্ণ হওয়ার পরই আহার্যের প্রশংসা করা উচিত। অতিক্রান্ত-যৌবনা স্ত্রীই প্রশংসা-যোগ্যা, বীর যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিলেই প্রশংসালাভের উপযুক্ত হয় এবং শস্য ঘরে উঠিলেই তবে তাহাকে প্রশংসা করা উচিত।

নীলরতনের কীর্তির দিকে চাহিয়া আজ আমরা বিস্মিত। তিনি আজ প্রশংসার অতীত, অনর্গল প্রশংসা করিয়াও তাঁহার কীর্তির মূল্য নির্ধারণ করা শক্ত।

আমাদের দেশ আজ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহার দুঃখ কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে, আমাদের এই ক্রমবর্ধমান দুঃখের জন্য আমাদের বর্তমান রাজনীতি ও রাজপুরুষরা কতটা দায়ী তাহা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নয়। যে জিনিসটা প্রত্যহ অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি তাহাই পরিশেষে নিবেদন করিব। ইহা বুঝিয়াছি যে, আমাদের মনুষ্যত্বহীনতা এবং আমাদের চারিত্রিক ত্রুটিও আমাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য কম দায়ী নয়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমি তাই মাঝে মাঝে দুই-একটি প্রশ্ন করিয়াছি। আমার মনে হয় ডাক্তার নীলরতন সরকারের মহজ্জীবনী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বর্তমান দুঃখের দিনে এই আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে।

সম্বর্দ্ধনার উত্তর

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

বিদেশী রীতি অনুসারে এই সম্বর্দ্ধনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ না দিলে আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়তো ক্ষুন্ন হইবেন। কিন্তু শুষ্ক ধন্যবাদ দ্বারা আপনাদের এই পরম প্রীতির ঋণ শোধ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি। মনে পড়িতেছে আমার প্রথম সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন আমার মা, আমার সেই সুদূর শৈশবে, আমার জন্মদিনে। আমার ললাটে চন্দনের তিলক দিয়া স্বহস্তে প্রস্তুত পরমান্ন দ্বারা আশীর্ব্বাদ-পূত স্নেহদৃষ্টিসিঞ্চনে তিনি যে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই নাই, যাহা দিয়াছিলাম তাহা অবর্ণনীয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। আপনাদেরও আমি সেই অর্ঘ্য দিতে চাই, কারণ আপনাদের এই সম্বর্দ্ধনা দেশ-মাতৃকারই আশীর্ব্বাদ। সম্বর্দ্ধনা ব্যাপারে আমার একটু সঙ্কোচ ছিল, তাহা আপনাদের নিকট অকপটে নিবেদন করিতেছি। সঙ্কোচের প্রথম কারণ, এই প্রশ্নটি আমার মনে জাগিয়াছিল সত্যই কি আমি সম্বর্দ্ধনা-যোগ্য ? কিন্তু ইহার একটা উত্তরও আমি পাইয়াছি, না পাইলে হয়তো আপনাদের সম্মুখীন হইতে পারিতাম না। মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিল সম্বর্দ্ধনাটা তোমার নয় সম্বর্দ্ধনা বঙ্গসাহিত্যের, তুমি উপলক্ষ মাত্র বঙ্গসাহিত্যের সেবক হিসাবেই তোমাকে আহ্বান করা হইয়াছে। আমার দ্বিতীয় সঙ্কোচের কারণটা আরও ব্যক্তিগত। সাধারণত আমি ভীড় হইতে দূরে থাকিতে চাই। আজকাল দেখিতেছি সম্বর্দ্ধনার ভীড় ভয়াবহ, সকলেই যেন সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য উৎসুক। দিল্লীর দরবারে তো সম্বর্দ্ধনা-প্রার্থীরা 'কিউ' দিয়া

দাঁড়াইয়া আছেন। অনেকে আবার নিজের জন্মদিনে নিজেই বাহিরের লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া ঘরে বসিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সম্বর্দ্ধনা-ব্যাপার হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাদের আগ্রহাতিশয্যে তাহা আর সম্ভবপর হইল না। বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধেয় পবিত্রদা এবং আমার বৈবাহিক শামুবাবুর আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করা কঠিন। আমার সম্বন্ধে আপনারা যাহা বলিলেন তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিবার সাধ্য আমার নাই। সে ভার মহাকালের উপর দিয়া আপনাদের শ্রদ্ধা স্নেহ ভালবাসার অকৃপণ উপহার শিরোধার্য্য করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।

এই ধরণের সভায় সাহিত্য সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা বলা উচিত। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে শাশ্বত সৃষ্টি কতটা হইয়াছে তাহার কোন সন্ধান বর্ত্তমান যুগের কোনও লেখক দিতে পারিবেন না। তাহার বিচার শাশ্বত কালের দরবারে যথাসময়ে হইবে। তবে একটা জিনিস বলা যায় বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর লেখা হইতেছে এবং তাহাদের বৈচিত্র্যও কম নয়। এই প্রাচুর্য্য আনন্দজনক। বাগানের প্রত্যেক গাছে যখন প্রচুর মুকুল আসে, মাঠে যখন কচি ধানের শ্যাম সমারোহ দেখি তখনই প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত কয়টা আম পাকিয়া ঘরে আসিবে অথবা কয় মণ ধান ভাণ্ডারে উঠিবে এ হিসাব করিতে মন চায় না। সরস্বতী প্রকাশের দেবতা, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বহুল সৃষ্টির বহুমুখী প্রকাশ লীলায় তাঁহার মহিমার স্বাক্ষর। প্রকাশের আগ্রহ ঔৎসুক্য এবং উন্মুখতাই জীবন্ত প্রাণের পরিচয় বহন করে। আজ যদি বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের জোয়ার আসিয়া থাকে তাহা তো আনন্দের কথা। যে সব সমালোচক 'আজকাল বাংলা সাহিত্যে কিছুই হইতেছে না, বলিয়া বিলাপ করেন তাহাদের মধ্যে কাব্যরসিক হয়তো থাকিতে পারেন, কিন্তু জীবন রসিক যে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে

পারে। যিনি জীবনরসিক তিনি শুধু বর্ত্তমানের লাভক্ষতি লইয়াই মাথা ঘামান না, তাঁহার দৃষ্টি অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ বিগত আগত অনাগত সর্ব্বকালে সঞ্চরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—

জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

জীবনের সম্বন্ধে এই পূর্ণ দৃষ্টি সাহিত্যের সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। বাণীর পাদপীঠতলে কত যে ঝরাফুলের পাপড়ি, কত যে অস্ফুট কুসুমের আকুতি বিছানো আছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু তবু তাহারা ব্যর্থ নয়, তাহাদের আত্মপ্রকাশের আগ্রহই তাহা-দিগকে সার্থক করিয়াছে। মানুষের স্মৃতির দৌড় বেশী নয়, তথাকথিত সমালোচকদের বিচার বিবেচনাও নির্ভুল নয়। মানুষ সুন্দরকেও বেশী দিন মনে রাখিতে পারে না, সমালোচকরা অনেক সময় শাস্ত্রের সংস্কার-খর্ব্ব মাপ কাঠিতে সব কাব্যের বিচার করিতে পারেন না, এক যুগের অজ্ঞাত লেখক অন্যযুগে দিগ্বিজয়ী প্রতিভারূপে স্বীকৃত হইয়াছেন এমন ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়। যাঁহাদের কথা আজ লোকে ভুলিয়াছে তাঁহারা একদিন যে অনেক লোককে আনন্দ দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি! বাংলা সাহিত্যের কথাই ধরুন—কবি লজ্জাবতী বসু বা বিনয়কুমারী ধরকে আজ কয়জনের মনে আছে? অথচ প্রবাসী পত্রিকার প্রথম যুগে ইহাদের সাহিত্য-সাধনা নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না। আজ আমরা তাঁহাদের মনে করিয়া রাখি নাই বলিয়া, অথবা সমালোচকদের খাতা বহিতে তাঁহাদের নাম চড়ে নাই বলিয়া তাঁহাদের আত্ম-প্রকাশের প্রয়াস যে বৃথা হইয়াছে একথা মনে করি না। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের রচনাপ্রাচুর্য্যে তাই উৎফুল্ল হওয়াই উচিত। যাঁহারা 'কিছু হইতেছে না কিছু হইতেছে না' বলিয়া রব তুলিয়াছেন,

মনে রাখা উচিত তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্যর্থকাম লেখক। আমার ধারণা বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ বর্ত্তমান যুগের কোনও লেখকের পক্ষে সহজ নয়। বোধ হয় সম্ভবও নয়। সেইজন্য তরুণ সাহিত্য সাধকদের প্রতি আমার নিবেদন, আপনারা সমালোচকদের দুর্বাক্য শুনিয়া হতাশ হইবেন না। আপনাদের যাহা দিবার আছে দিয়া যান, মহাকালের বিচারে যাহা টিকিবার টিকিয়া যাইবে। আর যদি নাই টেকে তাহাতেই বা ক্ষতি কি। মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা যখন ঐশ্বর্য্যশালী ছিল তখন তাহাদের মধ্যে কবি বা সাহিত্যিকও নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তাহাদের কোনও সন্ধান আর পাই কি? তাঁহারা আত্মপ্রকাশের আনন্দেই নিজেদের বিকশিত করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই সার্থক হইয়াছিলেন, আমার মনে হয় স্রষ্টার পক্ষে ইহাই চরম প্রাপ্তি। সৃষ্টির আনন্দটাই সবচেয়ে বড় লাভ, সমানধর্ম্মা কোনও রসিকের নিকট হইতে যদি দুই একটা 'বাহবা' পাওয়া যায় তাহা হইলে সেটা উপরি পাওনা। কিন্তু ওই বাহবার প্রত্যাশায় যদি কান পাতিয়া থাকি তাহা হইলেই দুঃখ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা পালন করা শক্ত। কিন্তু পালন করিতে পারিলে অনেক দুঃখের হাত হইতে এড়ানো যায়। উপদেশটি সুবিদিত—কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। ফলাকাঙ্খী হইয়াই তো আমরা যত দুঃখ ভোগ করি। সাহিত্য সাধকরা যদি প্রকৃত সাধক হন, সত্য শিব সুন্দরকে যদি নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে নিজের কল্পনা মাধুরী দিয়া সাজাইয়া ফলের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন তাহা হইলে পরমুখাপেক্ষী প্রশংসা বা পরানুগ্রহ-সাপেক্ষ বিত্ত বৈভব খ্যাতির মোহ তাহাদের বিচলিত করিতে পারিবে না। আমি জানি ফল সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সহজ নয়, মোটেই সহজ নয়, কিন্তু একথাও জানি অত্যধিক ফল-লোভী হইলে সাহিত্যসাধক ভ্রষ্ট-চরিত্র হন এবং তাঁহার দ্বারা

উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে সাহিত্য-সাধনা ব্রহ্ম সাধনারই সমকক্ষ ছিল, বিদেশীদের নকলে এবং যুগ-প্রভাবে আমরা সাহিত্য এবং ব্রহ্ম উভয়কেই ব্যবসার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছি, তাই আমাদের দুঃখ ও লাঞ্ছনার শেষ নাই। তাই ভেকধারী লোলুপ সন্ন্যাসী ও সাহিত্যিকে দেশ ছাইয়া গেল। কিন্তু ইহা লইয়া বেশী পরিতাপ করা বৃথা কারণ দুর্নিবার যুগ-প্রভাবকে স্বীকার করিতেই হইবে। সাধনার ধনকে আমরা যখন স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়াছি তখন তাহার অনিবার্য্য দুর্গতি সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। তবু আশা করিয়া থাকিব আধুনিক সাহিত্যের দিগদিগন্ত-বিস্তৃত ক্ষেত্রে যে অসংখ্য অঙ্কুর মন আজ আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধ্রুব সত্যের সন্ধান করিতেছে তাহাদের মধ্যে একজনও অন্তত মহামহীরুহের নভশ্চুম্বী মহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বকীয়তার সৌন্দর্য্যে নিজের প্রতিভাকে সার্থক করিবে, তাহার অভিনব বৈশিষ্ট্যের নূতন আলোকে সনাতন সত্য শিব সুন্দর আবার নূতন রূপে প্রতিভাত হইয়া রসিক চিত্তকে নন্দিত করিবে।

আপনাদের সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের নাম 'রবীন্দ্র-শরণী', এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গবেষণা করা। আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই, আশা করিব যে এ উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে যে উদ্যম ও বিদ্যাবত্তা প্রয়োজন তাহা আপনাদের আছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ খাড়া করা সহজ। কিন্তু তাহা গবেষণা নহে। রবীন্দ্র সাহিত্য বা রবীন্দ্র-চরিত্রে যদি কোন অনুদ্ঘাটিত তথ্য বা সত্য থাকে তাহাকে প্রকাশিত করাই গবেষণা। আমরা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা করি না, আমরা বহুবার চর্ব্বিত তথ্যকেই পুনর্বার চর্ব্বণ করিয়া পাণ্ডিত্য-খ্যাতি অর্জ্জন করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথকে

যুগপৎ বিশাল অরণ্য, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত এবং বিরাট সমুদ্র বলা যাইতে পারে। কবি, প্রবন্ধকর, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীত-স্রষ্টা, নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক, ধর্ম্ম-উপদেষ্টা, চিত্রশিল্পী, নৃত্যকলা প্রবর্ত্তক, বহুদেশদর্শী, শিক্ষাবিৎ, ব্রহ্মজ্ঞ, দেশপ্রেমী, মানবতার উপাসক রবীন্দ্রনাথকে আমরা যেন পল্লব-গ্রাহিতার অতিসহজ সংক্ষিপ্ত পথে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা না করি। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনে যে সুমহতী তপস্যা তাঁহার বহুমুখী প্রতিভাকে বিকশিত করিয়াছিল তাহা সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদেরও আয়াস স্বীকার করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিষয়ে আমাদের দেশে এবং বিদেশে কিছু আলোচনা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত নৃত্য-গীতের প্রসারও কম হয় নাই। স্বভাবতঃই রবীন্দ্র-প্রতিভার শিল্প-সুষমার প্রভাবই সাধারণ মানুষকে বেশী আবিষ্ট করিয়াছে। রবীন্দ্র চরিত্রের বলিষ্ঠ দিকটা আজও অনেকের নিকট অজ্ঞাত। তাঁহার আত্মসম্মান যে কত প্রবল ছিল তাহার অজস্র নিদর্শন তাঁহার রচনাবলীতে এবং সমসাময়িক ইতিহাসের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। সেগুলিকে একত্র করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা উচিত, শুধু তাহাই নয়, মনুষ্যত্বের যে প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে একদা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যে নপুংসক ভীরু মনোবৃত্তি আজ বাঙ্গালী জাতিকে বাক্‌সর্ব্বস্ব হাস্যাস্পদ বিদূষকে পরিণত করিয়াছে তাহার অবসান যদি আমরা ঘটাইতে না পারি তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্ব-গৌরব আর অক্ষুন্ন থাকিবে না। রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদের এখন আত্মানুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতা পাইবার পর আমাদের মনুষ্যত্ব দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে তাই নিজেদের ঘরেও বাংলাদেশেও আমাদের আর সম্মানের স্থান নাই, আমরা আজ ধনীর দুয়ারে নিঃস্বের মতো

দাঁড়াইয়া আছি। বহুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ 'কাঙালিনী' শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন—

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে

যদিও কবিতাটির বিষয় বস্তু স্বতন্ত্র তবু আমার মাঝে মাঝে মনে হয় দূরদর্শী কবি হয়তো বাংলা মায়ের ভবিষ্যৎ অবস্থা কল্পনা করিয়াই কবিতাটী লিখিয়াছিলেন। আমাদের নেতারা সর্বভারতীয় একাত্মতা, সমান নাগরিক অধিকারের জয়-গান আজ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র করিতেছেন। এ সব কথা শুনিতে ভালো। কিন্তু আমার প্রশ্ন যেখানে একদিকে দম্ভ ও পদানতদিগের প্রতি প্রসাদ বিতরণের আকাঙ্খা এবং অন্যদিকে কাঙালপনা সেখানে এই সব বড় বড় কথা কি পরিহাসের মত শোনায় না? সর্ব্বভারতীয় একাত্মতা করিতে হইলে যে সবল আত্মার প্রয়োজন তাহা বাঙালীর আজ আর নাই। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া সে আজ যাহা করিতেছে তাহা একাত্মতা নয়, আত্ম-বলিদান। জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই আজ আত্মসম্মানহীন বাঙালীর ভীড়, যদিও তাহার বাহিরের পোষাকে চাকচিক্য আছে, মুখের দাপটে আস্ফালন আছে, কিন্তু তাহার অন্তর শূন্য, মনে শান্তি নাই, পূর্ব্বপুরুষের গৌরব ভাঙাইয়া তাহার আর কত দিন চলিবে? সাহিত্যের কাজ মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগরিত করা। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে রবীন্দ্র সাহিত্যের উত্তরাধিকারী আমরা, আমাদের দুর্লভ প্রাপ্তি যে রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট পুরুষের সান্নিধ্যে এই সেদিন পর্য্যন্ত আমরা ছিলাম। আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের এবং রবীন্দ্র চরিত্রের অনুশীলন যদি সশ্রদ্ধ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়া করি তাহা হইলে আমাদের মূর্চ্ছিত আত্মা আবার সুস্থ হইবে। জাতির আত্মাকে জাগরিত করাই আপনাদের

গবেষণার বিষয় হউক। তবে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সাহিত্য আমাদের প্রেরণা দিতে পারে, উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু আমাদের চরিত্রবান করিতে পারে না। বাল্য-কাল হইতে তিল তিল করিয়া চরিত্র গঠন করিতে হয়। সে দায়িত্ব প্রথমতঃ পিতা-মাতার এবং প্রধানত পিতামাতার। ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠন করিবার সুযোগ আজকাল শিক্ষকরাও পান না। যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলে চরিত্র গঠন করা সম্ভবপর সে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আজকাল আর হয়না। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি আমাদের ভদ্রভাবে বাঁচিবার আকাঙ্খা থাকে তাহা হইলে আমাদের দেশের পিতামাতাকে সে বিষয়ে আগ্রহশীল হইতে হইবে। লেখক, শিক্ষক বা নেতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। দেশে এখন মানুষেরই বিশেষ অভাব। মানুষ গড়ার কাজেই এখন আমাদের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু বাঙালী সৃষ্টি নয়, ভারতবাসী সৃষ্টি নয়, উদ্দেশ্য সেই মানুষ সৃষ্টি যে কোনও দেশে যে কোনও অবস্থায় যে নিজের মনুষ্যত্বের জোরে মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে পারিবে। মানুষের একটা সামাজিক বা দেশ-গত পরিচয় নিশ্চয় থাকিবে, কিন্তু শুধু মাত্র সেই লেবেলের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আমরা যেন সীমাবদ্ধ না থাকি, মোহরের গায়ে যে ছাপই থাক সে ছাপেরই জোরে সে বাজারে চলিবে না যদি তাহার স্বর্ণত্ব সম্বন্ধে সকল নিঃসন্দেহ না হয়। আজ মানুষের জয় যাত্রার পথ এই গ্রহেই সীমাবদ্ধ নয়, আজ মানুষের মন হইতে জাতীয়তার সঙ্কীর্ণতা ক্রমশ অবলুপ্ত হইতেছে, তাই আমাদের দায়িত্ব ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে, আমাদের চারিত্রিক সম্পদ যদি এই অগ্রগতির অনুরূপ না হয় তাহা হইলে আমরা শুধু পিছাইয়া থাকিব না মৃত্যু আমাদের হইবে। তাই আজ আমাদের প্রার্থনা হোক—

দুর্জ্জয়ে করিয়া জয় বরমাল্য আমরা পরিব
মিথ্যাকে লঙ্ঘন করি সত্য পথে মোরা উত্তরিব।

লোভ মোহ বঞ্চনা সংশয়

জয় করি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়

হব মোরা নির্ম্মল নির্ভয়

মৃত্যুঞ্জয়ে আমরা বরিব।

মিথ্যাকে লঙ্ঘন করি

সত্য পথে মোরা উত্তরিব